শৈশব

শংকর বসু

ধ্রুপদী

প্রকাশক : প্রীতি মুখোপাধ্যায়, ধ্রুপদী, ৭/১বি অনরেট সেকেণ্ড লেন, কলকাতা ১৪ ॥
বিশাখা ঘোষ। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৯। প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌতম চৌধুরী
মুদ্রক : বিভোর মান্না, দেওয়ালী প্রেস, ১৪০/২ বেনারস রোড, শালকিয়া, হাওড়া-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রক : দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড,
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ॥

অন্নপূর্ণাকে

কানায় কয় বয়ড়ায় শোনে
পর্‌তি কথায় হয়-হয় করে ॥

হারাদিন গ্যালো হ্যালাফ্যালা
রাত্তর হৈলে বুড়ির কাপাসডলা ॥

ক্যাওড়াপাড়ার উলঙ্গ ছেলেটার শিরদাঁড়ার গাঁট বেয়ে-বেয়ে খুনখারাবি রঙে ভরা বেলুন পশ্চিমে শব্দহীন ফেটে গেলে হোলির গাঢ়তা আসে। আর সেই রাত, অন্ন-কথিত সেই নির্বোধ, নিষ্কর্মা রাত প্রায় এসে যায়।

তখন মোষের চামড়ার মতো অন্ধকার পানাপুকুর ভাঙতে-ভাঙতে উঠে আসে। কোথাও আলোড়ন থেকে যায়। অন্ধকার চারুমার্কেট, রেললাইন আর ক্যাওড়াপট্টির ভেতর দিয়ে এগোয়। ক্রমে, সুলতান আলম স্ট্রিট, ডোবা, জলা, টেলিগ্রাফপোস্টের উর্ধবাহু আর লাইনের সিগন্যাল অন্ধকার মাখতে থাকলে ঢালাই কারখানার গম্ভীর বুকচাপা আর্তনাদও থামে। পচা ডোবার জলে উল্টে থাকে নিরাহ শ্যাওলা, সেই অন্ধকার। আর তার ঢের আগে তামাম পাড়াটাকে ফালা-ফালা করে করাত-কলের ঘ্যাস-ঘ্যাস ঘিস-ঘিস শব্দের অন্তিম রেশ। রণর বাবা সমেত চার-পাঁচজন মজুরের ছোট্ট দলটা ছাড়া-ছাড়া হেঁটে গেছে, ফিরে গেছে, পেছনে অন্ধকার টানতে-টানতে, মৃত্যুর গাম্ভীর্যে। তাদের তাপ্পি মারা বুটজুতোর শব্দ অনুসরণ করে ভঙ্গুর ছায়া অশত্থ গাছের নীচে সমাধিস্থ। যেখানে শেতলার থান শাদা, চকচক করতে থাকে। জলামাঠে দাঁড়িয়ে সন্তু রণর বাবাকে একটা বাঁক নিতে দেখে। রণর বাবা সাঁকোর খুঁটি ধরে ডোবা পার হয়ে যায়।

আসলে ওটা মোটেই ডোবা নয়, পুকুর, বেশ বড় পুকুর। সন্তু আগে ভাবত সমুদ্র, কে যেন বলেছিল। শেষে কথায়-কথায় অন্ন বলে—ক্ষ্যাপছোস!

ক্যানো?

সমুদ্দুর নি অ্যাতো ছুটো!

তালে?

পুস্কুন্নি, সমুদ্দুর কী বিশাল!

অথচ অন্ন কখনো সমুদ্দ দেখে নি।

আজ দুপুর থেকে অন্ন বাড়িতে নেই, কোথায় যেন গেছে, ছেলেটা জানে না। মা বাড়ি নেই, সন্তুর দু-চোখে কোথাও ভাসছে না ছোটখাটো মানুষটার বেড় দিয়ে পরা শাদা থান, ক্ষিপ্র গতি। ফলে সন্তুর কষ্ট। সন্তুর কষ্ট হয়। বুকের ভেতর কত শব্দ জমতে থাকে, তার দম আটকে আসে। মোচার মতো সরু, ফ্যাকাসে-মুখটা কেবলই ভাসতে থাকে। দূরের অবয়বে তার নিত্য ভুল হয়ে যায়—ঐ তো মা আসছে! অথচ মা আসে না, মা যেন কোনোদিনও আসবে না। এ সবই সে উচ্চারণ করে মনে-মনে: মা চলে এসো, আমি আর হজমিগুলির পয়সা চাইব না, রোজ রোজ পড়ব। আর তার কষ্ট হয়। তখন সন্তু কিছুই চেনে না, চিনতে পারে না। উকিল-ঠাকুমার বাড়ির পাশ দিয়ে পাক খাওয়া সুলতান আলম স্ট্রিট তখন এক ফাঁস মাত্র। সেই ফাঁস গলায় লটকে সে কেবল মাকে খোঁজে, খুঁজতে থাকে—কাকীমা, মা কখন ফিরবে? মা কোথায় গেছে? মা কোথায় যায়…

অ্যাই আইল বইলা…

থেকে-থেকে সন্তু ঘর-বার করছিল। মাঝে-মাঝে চলন্ত মানুষের ছায়া দেখে, বা দু-চারটে পাখির ডানার শব্দে, লাইনের সিগন্যালের রঙবদলে থেমে যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে ভেজামাটিতে ডান পায়ের পাতার চাপ দিল। ক্রমে মাটির বুকে তার ক্ষুদে পায়ের ছাপ স্পষ্টত ফুটে উঠলে সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে দু-একটা পাক খেল। সেই পদচিহ্ন গভীর

এবং ঢালু এক গর্ত হয়ে গেলে সন্তু একটু চঞ্চল, তার হাসি পেল। একেবারে হঠাৎই মনে পড়ে গেল 'পৃথিবী' এই শব্দটা। মা কাল কিছুতেই বলতে পারছিল না, অথচ মা সমুদ্রের মানে জানে! পৃথিবীরও। কারণ অন্নর মুখে সেই হতাশ ব্যাকুলতা ছিল, যা একমাত্র জানা থাকলেই হয়। কিন্তু মা কিছুতেই পারছিল না, পারল না।

চন্নুর মা ডাকল, 'সন্তু! অ সন্তু! চা-রুটি খাবি নাকি?'

সন্তুর সাড়া নেই, চন্নুর মা আরেকবার ডাকে। সন্তুর সাড়াশব্দ নেই। থেকে-থেকে সন্তু এরকম ডুব দেয়, তখন কোথায় যেন শীতের সকাল, কুয়াশা, ফ্যানের গন্ধ। রেফিউজি কলোনির সন্ধে, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া। মালগাড়ির টিকিস-টিকিস শব্দ। সন্তু তখন চেয়ে আছে তবু দেখছে না, এক হাত দূরের কোনো-ও কথা, শব্দ, শুনতে পায় না। তখন সন্তুর সাড়া পাওয়া যায় না। চন্নুর মা-র গলা ফ্যাসফ্যাস করছিল: সন্তু! অ সন্তু! সন্তু তখনো পায়ের ছাপের ওপর চোখ বিঁধিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আর মাটি মানে তো পৃথিবী! অন্ন বলেছিল। সন্তু পৃথিবীর বুকের ওপর আবছা কচি পায়ের ছাপ তন্ময় হয়ে দেখছিল। চন্নু এসে ওর ইজের ধরে টানল, 'কী রে চ!'

নাহ্।

চ না!

নন্ না।

কার জন্যে মন খারাপ?

জানি না, ভাগ!

তখন হালকা শরীরের চাপে মাটিতে খোদাই হয়ে যাচ্ছে তার পায়ের ছাপ। মেয়েটা ভয় পায়, অযথা, বড়-বড় চোখে চন্নু সন্তুর লিকলিকে পা, পায়ের পাতা দেখতে থাকে। আর সেই টিনের চালা এবং পেয়ারা গাছের বেঁটে ছায়ার প্রায় নির্জন, ভুতুড়ে বাড়ি থেকে শ্লেষ্মার শব্দে তখন···কহিল সঞ্জয় তবে শুন নৃপবর···

চন্নুর দিকে একবার তাকিয়ে সন্তুকে ভেবে নিতে হয় পরবর্তী কার্যক্রম, আর এমনিতেই সে বড় ফাঁকা, শূন্য হয়ে আসছিল। চন্নুর মার

ডাকে সাড়া না-দেওয়া, সামনে উড়তে থাকা চন্নুর গোলাপিফ্রক অস্বীকার করা, তাকে আরো নির্দয়-একা করে দেয়। অথচ ছেলেটা গোঁয়ার-ই থেকে যাচ্ছে। চন্নুর দাদুর গলায় তখন সঞ্জয় ক্রমাগত সৎ পরামর্শ দিয়ে যেতে থাকে। শীতের আকাশ কেবল ধোঁয়ার অবলম্বন হয়ে ওঠে। অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির তেরচা মাঠে হিসি করতে-করতে অযথা খিস্তি করে কেউ। তীব্র গন্ধ উঠে আসছে, বা সেই খিস্তিতে ওরকম ঝাঁঝ ছিল। চন্নু সতুর হাত ধরে টানছে : বেশি পাকা নাহ্, চ। সতু ঘাড় কাত করে, আর চন্নু এই ভঙ্গির মানে জানে বলে তার গোলাপি ফ্রক দুলে ওঠে, 'মর!'

চন্নু সতুর থেকে বছর দু'য়েকের বড়, কিন্তু হাবভাবে সতুকেই বড় মনে হয়। বিশেষ সে যখন চন্নুকে মামুলি আক্রমণ করে লম্বা চুল টেনে। চন্নুর সঙ্গেই তাকে প্রায় দুপুর কাটাতে হয়, পেয়ারা গাছের তলায় যেখানে ফাটা মেঝে থেকে ঝাঁঝ উঠে আসে। বা কখনো-কখনো কুলগাছের নীচে অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির লাগোয়া পুকুরের ধারে। রান্নাবাটি খেলা। বা বর-বউ খেলা। খেলতে-খেলতে কে যে কখন লুচিপাতা ছিঁড়ে সংসার লোপাট করবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আবার কুলকাঁটার ডগায় এই সতুই রেখে যেত রক্তের ফোঁটা। চন্নুর জন্যে সতু অ্যাম্পুল খুঁজত, একবার একটা ফিতে পেয়ে চন্নুকে দিয়েছিল। আর এখন তার চন্নুকে ভালো লাগছে না। চন্নু চলে গেল, সতু অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির হলুদ ডোবার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে দিল। ছাগলের নাদি ছড়ানো বারান্দায় বসে থেকে রেললাইন দেখে, এই লাইন তার অতি পরিচিত। সিগন্যাল বদল হলে, সবুজ হলে সতুর আনন্দ হয়। এখন লাইনের পাশে অন্ধকার ঢিপি হয়ে আছে। ক্যাওড়াপট্টি আর রেফিউজি কলোনিতে কেরোসিনের ম্লান আলো জ্বলে ওঠে। কোথাও পাখির ক্ষুদ্র শরীর ডানা ঝাপটায়। সেই শব্দ শোনা যায়, কিন্তু পাখিটাকে সে দেখতে পায় না। তখন কাঁচা নর্দমার ওপর ফেলা নারকেল গাছের গুঁড়িতে শাদা রঙ বিস্তৃত। এই রঙ ক্রমে থানের মতো, আঁচলের মতো খুলে মেলে গেলে সে টের পায় অমর ভাঙা অবয়ব। নারকেল গুঁড়ির ওপর সতর্ক, টালমাটাল সেই অবয়ব এগোতে থাকলে সতু ছুট লাগায়।

কারণ 'সন্ধ্যা বইয়া যায়', সন্তুর এখন পড়ার কথা। একছুটে ঘরে ঢুকে বর্ণপরিচয় খুলে আসন-পিঁড়ি হল এবং দুলতে থাকে। সামনে লম্প উগরে চলে কালো ভুষোধোঁয়া আর কেরোসিন-গন্ধ।

লম্পর কালচে শিষ, ধোঁয়া আর কেরোসিনের ঝাঁঝের ভেতর তার নাক অন্ধকার দেয়াল তোলে। গালের একদিক অন্ধকারে তলায়।... 'এ অজগর আসছে তেড়ে' বাক্যটি শেষ হওয়ার আগেই হাই ওঠে, খিদে পেয়ে যায়। তখনই টের পেল চন্নুর মা ডাকলে তার যাওয়া উচিত ছিল, তার খিদে পেয়েছিল। হাই উঠতেই থাকে, ফলে দুলুনির মাত্রা বাড়তে থাকে। যেন সে এই প্রচণ্ড দুলুনি দিয়ে ঘুম তাড়াবে। অথচ দোলার ছন্দে সে ক্রমেই সরে যাচ্ছে কোথাও, সেখানে নীল রঙ স্রোত হয়ে আছে। সন্তু প্রতিটি তরঙ্গ টের পেতে থাকে, সরে যাচ্ছে দুস্তর সময়। অন্ন কি এসে গেল? এসে যাচ্ছে?

দুলুনির সঙ্গে গলায় কেমন সুর এসে যায়, সে এখন সুর সম্পর্কেও সচেতন বলে উচ্চারণে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত জোর দিতে থাকে। 'অ' এই অক্ষরটি অস্ফুট আর 'অজগর' তার উচ্চারণ, মাত্রা এবং সুরে বিশাল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

টিনের গোল চাকতিটা উনুনের ওপর চাপিয়ে রুটি সেঁকতে-সেঁকতে চন্নুর মার সঙ্গে কথা বলছে অন্ন, 'কোনো কামই হইল না, হুদাহুদি গ্যালাম, ক্যাবল ঘুরায়···আইজ না কাইল, য্যামন আগে ঘরের বাইর হই নাই ত্যামনই ভগবান কয়, খাড়া তরে জব্দ করতাছি।'

আটা সেঁকার খিদে-জাগানো নরম উষ্ণ-গন্ধের সঙ্গে এই-সব কথা মিশে যায়, মিশে যেতে থাকে। রুটির মধ্যভাগ ফুলে উঠছে, ধোঁয়াও থাকে, লম্বা ধাঁচের মুখটিতে তাপ ও বাষ্প। অন্ন তাতে আলোকিত। সন্তুর খিদে পেয়েছে জেনেই কোনোক্রমে হাত-পা ধুয়ে রুটি করতে বসে গেছে। সন্তু জানে না কে বা কারা অন্নকে জব্দ করছে এবং কেন। সে কেবল খিদের চোরাগোপ্তা মার, তলপেটের মোচড় সামলায়। অন্ন চন্নুর মাকে সাক্ষী রেখে অতীত ও বর্তমানের টুকরোটাকরা কথা, গল্প জুড়ে যাচ্ছে। ক্রমে একটা কাহিনী হয়ে ওঠে। অন্ন বলে, 'বুঝলেননি দিদি'

এবং গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চন্নুর মা ধৈর্য রাখে। তারপর বলে, 'বুঝি না আবার···।'

আর শোকের তীব্র অথচ শীতল এক অনুভূতি সতুকে আস্তে-আস্তে গিলতে থাকে। সতু ভাবে, হায় রে মার কাজটা কেন যে হাসিল হয় না। সতু অবশ্য খুঁটিনাটি কিছুই জানে না। কেবল ঐ টুকরোটাকরা কথা থেকে আবছা-আবছা একটা ধারণা হয়েছে। তাতে এইটুকু মাত্র বুঝেছে, পেনশন পাশ হয়ে গেলে মাসে চারটে রেশনের টাকার ব্যাপারে অন্ন নিশ্চিন্ত হবে। তবু কাজটা কিছুতেই হাসিল হয় না বলে অন্ন কপালের দোষ দেয়। বিলাপ করতে থাকে। সেই বিলাপে পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরো একটা জীবন নড়ে চড়ে ওঠে অজস্র ভাঙা ছায়া, মরা ডাল আর খিন্নতা নিয়ে। আর পাতলা অন্ধকার লাইন-ধারের জলায় বুনে যেতে থাকে মিহিজাল।

'ছুটোকালে মায় মারা যায়···মায় কী বস্তু জানিনাই···তেরো বছরের কালে বাপে বিয়া দিল ··অন্ধকার থাকতে উইঠা ধান সিদ্ধ করা, বাইরবাড়ি উঠান ল্যাপা-মোছা···একগুষ্টির রান্না আর পিসশাশুড়ির কিল খাইছি···।'

এভাবে বুকের ভেতর থেকে, পাঁজরার হাড় থেকে, মজ্জার ব্যথা নিয়ে উঠে আসে পুরাতন দুঃখকষ্ট, যা দিয়ে অন্নপূর্ণা নির্মিত। সতুর কুয়াশার পরত-জমা মস্তিষ্কে অন্ন-সম্পর্কিত যা-কিছু অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি সবই এরকম টুকরো কথা আর ঘটনা। বস্তুত অন্নর ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই তার কাছে, ফলে সেই বালক নিক্ষিপ্ত, একাকী, নীল শূন্যতায়। সে শোকদুঃখের গন্ধ পায়। শোক এবং দুঃখের গন্ধ থাকে।

গলা ছেড়ে পড়তে থাকে 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে' ··আর পড়তে-পড়তে তার চোখ হঠাৎ ক্যাওড়াপট্টির মাথার ওপর দিয়ে রেল-লাইনের দিকে উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে গোলাপি মলাটের পুস্তকে, যেখানে ঈশ্বরচন্দ্রের গম্ভীর মুখ! সে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে থাকে। গ্যাসপোস্ট আর দামোদর নদের গল্প মস্তিষ্কে উজ্জ্বল থেকে যায়। দ্রুত মলাট ওল্টায় বলে অজগরের ছবি দেখে এবং হঠাৎ মনে হয় অ এর

অজগর জ্যান্ত, তা নড়তে থাকে, কুণ্ডলী খুলে যায়। অথচ সে ভয় পায় না। ক্রমে সেই অজগর আপসে ছবি হয়ে গেলে সতু বোঝে তার ঘুম পাচ্ছে। আর ভাবে, ভাবতে থাকে—অ-এ অজগর কেন হয়? কয়েকদিন আগে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অন্ন তখন বড়ই কোমল, সতুর পিঠে সে হাত রেখেছিল, 'আরো লিখাপড়া করলে তয় জানতে পারবা সুনা!'

আজ আর সতুর ইচ্ছে নেই মাকে জিজ্ঞেস করার। কারণ সে জানেই অন্নর পক্ষে এ কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বরং কাকামণি ঘরে থাকলে এই সুবাদে আবার জানাবেন যে শিশুরা বড় জিজ্ঞাসু হয়, কিন্তু তাদের কথার মিথ্যে জবাব দেওয়াটা ঘোরতর অন্যায়।

কাকামণির কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কোথাও থালা পড়ে যাবে নির্ঘাৎ। ঝনঝন শব্দ গড়িয়ে যাবে। কেউ হাসবে, কেউ বলবে : ঐ আবার শুরু হইল। তার পর আর কোথাও কাকামণি থাকে না। মানুষটা হঠাৎ-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন।

সতুর জিজ্ঞাসা না করার অন্য কারণও আছে, আজ অন্ন বেজায় কাহিল। সতু অন্নর কানের লতির নীচে ক্ষুদি-ক্ষুদি লাল তিলগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সর্ষের দানা সেই তিলগুলো সম্পর্কে অন্ন বলে, 'লাল তিল দুঃখের কারণ।' এই-সব কথায় সতু ক্রমে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, দুঃখ শোক শরীরেই থাকে, বা দুঃখের শরীর হয়।

ফিরে এসে অন্ন ছর্ ছর্ করে হাত-পায়ে জল ঢেলেছিল। জলো হাত বুলিয়ে নিয়েছিল ঘাড়ে। তার পর তোলা-উনুন পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে ক্রমাগত ধোঁয়া ওগরাতে থাকলে, আঁচলের তলায় কাঁসার বাটিটা (যা দিন দুয়েক আগে ছাড়িয়ে এনেছিল) লুকিয়ে চন্নুর মার কাছে যায়। বাটিটা আঁচলে ঢেকে হুট করে অন্ন চ'লে গেল। তখন এই টিন আর টালির চালার নীচে বয়স্ক প্রাণী বলতে দুজন, অন্ন আর চন্নুর মা। অন্নর আঁচলের তলায় বাটিটা লুকিয়ে নেওয়ার অর্থ যাতে সতু না দেখে। অথচ সতু জানে মা চন্নুর মাকে কইবে, 'অ চন্নুর মা দিদি আমারে একবাটি আটা হাওলাত দ্যান, পরশু দিমু।' আর এতসব জানে

বলে সন্থ বুঝতে পারে না, মা কেন আঁচলের তলায় উজ্জ্বল কাঁসার বাটি লুকোয়! সে তো সবই জানে! স-ব। তখন অন্নকে বড় অসহায় দেখায়। যেন সে কোনো পাপকার্য করছে। গোপন চলাফেরা করে। আঁচলের তলায় ঝকঝকে বাটি লুকোয়।

অজগরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঝিম এসেছিল, তখন চন্নুদের দাওয়ার পুরনো খুঁটিতে পিঠ ঘষতে-ঘষতে বিপুল উপাখ্যান শেষ করে অন্ন চীৎকার করল, 'কী রে গলায় আওয়াজ নাই ক্যান?'

তুমি থাকো না ক্যানো?

অমা! যার লাইগা চুরি করি হেই কয় চোর!

কথাটা সন্থ অনেকবার শুনেছে, নানান প্রসঙ্গে। আর যে-ক্ষেত্রে সে নিজেই এই কথার লক্ষ্য তখন তীব্র এক অপরাধ-বোধ তাকে দংশন করেছে। বা, সেই বোধ তখন এক শানানো ছুরি যা আমূল বিদ্ধ হয় তারই শরীরে। অথচ সে কখনো অন্নকে চুরি করতে বলে নি, সে জানে অন্ন চোর নয়, কেবল লক্ষ করেছে কাপড়ের তলায় বাটি লুকিয়ে অন্নর কর্ম করার ক্ষিপ্রতা।

সাকুল্যে একবারই মাত্র সন্থ চোর দেখেছে। তার আগে চোর সম্পর্কে যে-সব গল্প ঘটনা ইত্যাদি শুনেছে তাতে তার ধারণা ছিল চোরের শরীর লোহা দিয়ে তৈরি। থ্যাবড়া মুখ, হাতের থাবায় লোম থাকে এবং পিটপিটে চোখে টর্চের আলোর মতো শয়তানি জ্বলজ্বল করে, ফোকাস মারে। সন্থ যাকে দেখেছিল, লোহার শিকল দিয়ে তার পা গ্যাসপোস্টে বাঁধা। পেছনে ঘোরানো হাতেও শেকল এবং গায়ে শার্ট না থাকায় তলপেট, ওল্টানো নাইকুণ্ডু আর পাঁজর দেখা যাচ্ছিল। তার মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সন্থকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্ভবত সে একগ্লাস জল চায়। পেট দড়ির মতো শুকোচ্ছিল, খুব খিদে। পুরনো খিদেয় তার পেট পোস্টের সঙ্গে মিশে ছিল।

জল, জল!

সেই কিশোর, যাকে চোর বলে বেঁধে রাখা হয়েছে, পাঁচজনে যাকে পুলিশে তুলে দেওয়ার মত জাহির করে বাজারে বা কাজকম্মে চলে

গেছেন, সতুর কাছে সে জল চায়। কিন্তু চোরের পিপাসা থাকতে নেই, চোরের ওষুধ এবং পথ্য দুইই হল নির্দয় ধোলাই, গ্রীষ্মকালের দুপুরে পিচ রাস্তায় চিৎ করে ফেলা। আর ভদ্রজনে বড়জোর সদুপদেশ সমেত দশটা পয়সা দিয়ে যাবেন, তার দায়িত্ব উপদেশগুলি মুখস্থ করা। ত্বকের গভীরে চালান করে দেওয়া।

কাঠগোলার মালিক ভুলুদা ছেলেটাকে জলবিছুটি দিয়ে পাঁদাকে থাকে, সঙ্গে 'বাঞ্চোৎ, খেটে খেতে পারিস না, এই বয়সে চুরি···!' আজাদ হিন্দ ক্লাবের ব্যায়াম করা দু-চারজন লোক গ্যাসপোস্টের গায়ে ঝোলানো সেই ছিবড়ে মাংসের পেটে দমাদম ঘুষি ঝেড়ে যায়। ভুলুদা থুতু আর গয়ের ছিটিয়ে দেয় তার থ্যাৎলানো মুখে। সতু একগ্লাস জল নিয়ে সেই চোরের সামনে গেলে ছেলেটার ফোলা চোখের কোল জুড়ে নীল কালশিটে ফেটে রক্তের ধারা নামে। তখন ভুলুদা সতুর সামনে, ভুলুদা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে : কী রে?

জল চাইছিল যে!

মুতে দে।

ক্যানো?

বলছি মুতে খাওয়া।

ক্যানো!

চোরের শাস্তি, মুতে খাওয়া।

নাহ্।

না?

নাহ্।

ঠিক আছে গ্লাসটা নিয়ে আয় আমি···

নাহ্।

ভাগ্ শালা···!

সতুর হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ভুলুদা গ্যাসপোস্টে আছড়ে ভেঙে ফেলে —গোলায় যাস ফুলকি নিতে, বেঁধে রেখে দেব, মুতে খাওয়াব শালা···পিরিত নাহ্। গ্যাসপোস্টে বাঁধা সেই ছেলেটার

শরীর আস্তে-আস্তে ঢিলে ভাবে নেমে যাচ্ছিল, সামান্য গোঙানি ছিল, ক্রমে অজ্ঞান হয়। এবং ছেলেটার অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাকে ভুলুদা অবিশ্বাস করে বিছুটির বাড়ি মারতে থাকে, সন্তু কেঁদে ফেলে। এবং এমন একটা লোকের কথা ভাবতে পারে না যাকে বলা যায় ওকে ভুলুদার হাত থেকে বাঁচাও। আর অদ্যাবধি সন্তু জানে না ছেলেটা আসলে কী চুরি করেছিল, তারপর অনেকদিন সন্তু কাঠগোলায় যায় নি, দিদি একা-একা যেত। দিদির একা যেতে ভয় করে। তবু যেত, না গেলে যে উনুনই ধরবে না। দিদির যে কেন ভয় করে সন্তু ঠিক জানে না, অথচ দিদি গেলে ভুলুদা কত ফুলকি দেয়! তবু দিদি ভয় করে!

জাগা আছেন নি, অ অন্নদি!

কন।

কই, টাকা পাইবেন তো নাকি?

ঘুরতাছি তো কম না, অ্যাহন হগলই কপাল।

সন্তুর পড়া চুকেবুকে গ্যাছে, অন্নর খুচরো কথার ভেতর সে মার মেজাজ ধরার জন্যে সচেষ্ট। আর টাকা-পয়সার কথায় তার চোখ চলে যায় রেললাইনে। রুটি সেঁকার সেই কাঁচা গন্ধ তখনো পাতলা এবং উড়ছে। যদিও সন্তুর এখন খিদে নেই আর। রেললাইনে এখন তার চোখ; ঐ লাইন ধরে বহুকাল যাবৎ সবুজ রঙের ঢাকা মেল আসবে এমন কথা ছিল। সেই গাড়ি ক্যাওড়াপাড়ার সামনে, জলার সামনে হঠাৎ দাঁড়ালে একটা মানুষ হাঁটতে থাকবে। সঙ্গে বাক্স-প্যাঁটরা বা কিছু মালপত্র থাকবে। সে হয় কাউকে জিজ্ঞেস করবে : সরিদের বাড়িটা কোন্‌দিকে? সন্তুকে চেনেন? কোথায় থাকে? বা, এই টিনের চালার কড়া নাড়তে থাকবে।

মার মুখে বহুবার শোনা এই বৃত্তান্ত সন্তুর কাছে এরকম একটা ছবি হয়ে ফেরত আসে। অন্ন বলত, 'অ্যাই রেললাইন ধইরা ঢাকা মেলে তর বাবায় ফিরব, বুঝছসনি সন্তু।'

জন্ম থেকে শুনে আসছে কথাটা। আর বাবার ফিরে আসাটা

স্বপ্নের মতো। হাতে পায়ে ওম্ পায়। শীতের আরাম আসে, খেস গায়ে দেওয়ার মতো, বাবার একটা খেস ছিল, এখনো আছে। যতবার সন্তু খেসটা গায়ে দিয়েছে, অন্ন ঠিক বলে উঠত, বলে ফেলত—নারানগঞ্জ থিকা ফেরার পথে কিনছিল…। সন্তু গন্ধ পেত নারানগঞ্জের, জলের। অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তখন। কুলগাছ ভরে যায়, নিষ্ফলা পেয়ারা গাছও ফেলে দেয় অতীব পাকা দু-একটা ফল, অন্ন পায়েস রান্না করে। সরি এলোচুলে গন্ধ তেল মাখে আর সন্তুর ইস্কুলে যাওয়ার দিন এসে যায়। সে বিড়বিড় করতে থাকে : বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমাদের খুব কষ্ট ; মার কষ্ট হচ্ছে, আমাদের কষ্ট হচ্ছে…। সন্তুর গায়ে কাঁটা দিতে থাকে, কষ্ট তীব্র হয়। যেমন হয়েছিল সরির সঙ্গে বারোয়ারিতলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে। নদের নিমাই পালা ছিল, সরির কোলে বসে যাত্রা দেখতে-দেখতে হঠাৎ সন্তু ডুকরে কেঁদে ওঠে, নিমাই তখন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে। সরি আঁতকে ওঠে, 'অ্যাই ভাই, ভাই, কান্দোস ক্যান সুনা…কান্দোস ক্যান…!' সন্তু কেবল হিক্কা তোলে, ফিরে এসে মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মা, বাবু সন্ন্যাসী হয়েছে ? বল না মা ? ও মা ! বল না !' অন্ন কোনো জবাব দেয় নি। থাবড়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেছে, 'অ্যাতো বড় মাইয়ার বোধাবোধ নাই, উনি যাত্‌রা দ্যাখতে যান ; যাত্‌রা দ্যাখে ফাত্‌রা লোকে…।'

ওমা, বল না !

চুপ যা। ঘুমা হারামজাদা…হাড়মাস কালি কইরা দিল…তিনি তো পলাইয়া বাঁচছেন…যত হাঙ্গামা অখন তুই মাগী পোয়া…।

অন্ন রুটি সেঁকতে-সেঁকতে সরি ফিরল। চটের থলের ভেতর থেকে কাঠের ফুলকি বের করে উনুনের পাশে ঢালতে-ঢালতে বলল, 'কহন ফিরলা ? বুঝলা মা, র‍্যাললাইনের সামনের ডোবাটায় না ম্যালা কলমি শাগ হইছে, কাইল নাওনের সময় আনুম অনে, আর হ…কানাইদা কইছে সন্তুরে লইয়া যাইতে, ভরতি কইরা নিব।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলতে-বলতে সরি চাতালে যায়, জল

ঢালার ছর্ ছর্ শব্দের সঙ্গে মিশে ওর কথা দ্রুততর হয়। আর একটু দূর থেকে বলে স্বরের সেই তীব্র সূক্ষ্মতা টের পায় সতু। সরির গলা বড় মিহি, গলুর দাদা বলে গানের গলা। কিন্তু সরি গান শেখে নি, গান শেখে না, বনবাদাড় ঘেঁটে বেড়ায়, টুকিটাকি সংসারের জিনিস জোগাড় করে, কাকীমার কিংবা পাড়ার লোকের ফরমাশ খাটে। আর সেই গানের গলা পাঁচটা। কাজের কথায়, সূঁচের সূক্ষ্মতায় বিদ্ধ করে, ফোঁড় টানে তিনটি প্রাণীর সংসারে। সতু হঠাৎ লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল। অন্নর পিঠের কাছে দাঁড়ায়। অন্নর আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে: কানাইদার ইস্কুল ভালো না, কানাইদার ইস্কুলে পড়বো না।

তয় কি মুখ্যু হইয়া থাকবি!

কানাইদা মারে।

'ঘ্যান ঘ্যান করিস না, সরি রাইত হইছে খাইয়া ল, অন্ন এনামেলের থালায় দুখানা করে রুটি দেয়, পেছন ফিরে একটা কৌটো নামায়। তখন অন্নর বেঁটে ছায়া সেই মাটকোটায় থ্যাবড়া হয়ে ঝুলতে থাকে। ছেলেমেয়ের পাতে গুড় দেয় অন্ন। আর সতু খেতে-খেতে অলস হাত থালায় ফেলে রাখে, পানাপুকুরের নড়বড়ে সাঁকো ধরে সরির ইস্কুলে যাওয়ার ফ্রক উড়তে থাকে। দিদির বগলে বই. আর কানাইমাস্টারের ড্যাবডেবে চোখ গোরুর মতো হামলাতে থাকে। সতু ভয় পায়। সতুর কেমন ভয়-ভয় করে। এই তো সেবার যখন সবাইকে বোঁদে খাওয়াল, সেদিন কী মারটাই না মারল! কী যেন ছিল, সতুর ঠিক মনেও পড়ে না···স্বাধীনতা···। কানাইমাস্টার নিজেই তেরাঙ্গা তুলল বাগ্দিপাড়ার বুকে। ক্যাওড়া, বাগ্দি আর কাঠগোলা আর পাইপের ভেতর থেকে সব ছানা-পোনার দল, ইজেরের দড়ি টানতে-টানতে এসে বোঁদের ঠোঙাটা ঘিরে দাঁড়াল। কোমরে ন্যাতা জড়ানো ছেলেটাকে আঁকপাঁক করতে দেখে সতুর হঠাৎ মনে হয়েছিল—কেড়ে না নেয়! ছেলেটাকে সতু আগেও দেখেছে, লেকের ধারে বড়-বড় পাইপগুলোর ভেতর ওরা থাকে। বাপ, মা, ভাই, বোন সবাই। সবাই মিলে বাজার থেকে তরিতরকারির খোসাটোসা কুড়িয়ে আনলে ওর মা সারাদিন ধরে সেই জাবনা ফোটায়। ছেলেটা

বোঁদে খেয়ে গলা ফাটিয়ে 'বন্দেমাতরম' দিল। একবার, দুবার, তিনবার। শেষে হঠাৎ কানাইদার হাত ধরে ছেলেটা বলেছিল : এবার থেকে রোজ হবে তো ?

কী !

স্বাধীনতা···

হঠাৎ কী যে হল কানাইদা দম বন্ধ করে ছেলেটাকে মারতে লাগল। বোঁদের হলুদ ছোপ, রক্তের দাগ আর সর্দিলালায় মাখামাখি ছেলেটাকে হিক্‌কা তুলে কাঁপতে দেখে অসহ্য রাগে সতুর গা ঘিনঘিন করতে থাকে। চলে যেতে-যেতে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা ফিরে-ফিরে কানাই-দাকে দেখছিল। আর হিক্‌কা তুলছিল।

সতু এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় : কানাইমাস্টারের সেই ডাবডেবে চোখ, পাইপপাড়ার ছেলেটার আমসি-মুখ, মুখে রক্তের ক্ষীণ রেখা। এই নির্দয় স্মৃতি যেহেতু কানাইদাকে দেখামাত্তর মাথায় চাগাড় দেয় সে-কারণে সতু আর কখনো স্বাধীনতা উৎসবের ভিড়ে দাঁড়ায় নি! ব্যাণ্ডপার্টির শোভাযাত্রা বেরোলে পুকুরপাড়ে কুল গাছের ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে জমিতে কিছুক্ষণ অযথা কাটায়। ভেজা গন্ধ গড়ে ওঠে, আলখাল্লার মতো সেই গন্ধ ঢিলে হয়ে থাকে। এখন তার হঠাৎ এই-সব সাত-সতের কথা মনে হওয়ায় রুটিতে বেকায়দায় কামড় দিয়ে ফেলে। আর খট্ করে একটা শব্দ হয়, সেই শব্দের সঙ্গে মগজে চালান যায় পয়লা দুধের-দাঁত নড়ার স্পষ্ট ব্যথা। সে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে, চোখে জরির সুতো, জল ঝরতে থাকে।

কী হইল, আাই সুনা ?

সতু অ সতু কী হইছে ভাই! জল খা।

সরির আর খাওয়া হয় না, সে সতুকে একগ্লাস জল গড়িয়ে দেয়। মুখের কাছে গ্লাস ধরে : খা, খা। বার দুই-তিন ঢোঁক গেলার চেষ্টার পরে সতু গোঙায় : নড়ছে!

কী ?

দাঁত।

অন্ন আঙুল দিয়ে টিপেটুপে দাঁতটা পরখ করতে থাকে : সরি একনাল সুতা আন দেখি। সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অন্ন দাঁতটা বেঁধে দিল। সতু অল্প-অল্প টানতে থাকে। টানে আর মাথার দিকে বেদনার স্রোত চলে যায়। সতু ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে পারে, সরি একটুতেই কাহিল হয়। এই তো গেল বছরের কথা, অন্ন উনুন ধরিয়ে চান করতে গেছে। শীতকাল। বড় শীত। সতু উনুনে পা সেঁকতে-সেঁকতে ফোস্কা ফেলে দেয়। ফিরে এসে অন্ন তার ওপরই দুমদাম বসিয়ে দিয়েছিল : কী করুম হা কপাল! কপালে কী অ্যাইয়াও আছিল·· এই ছাওয়াল লইয়া আমি অখন কী করি···বোধাবোধ নাই···। ধীরেসুস্থে টানতে-টানতে সতু দাঁতটা খসিয়ে ফেলে, দেদার রক্ত পড়তে থাকে। রক্ত দেখলে সরির মাথা ঘোরে, সরি সতুর হাত ধরে : চল ভাই, গর্তে দিয়া আসি!

অন্ন হঠাৎ মায়াময় : যাও, দিদির কথা শুনতে লাগে।

অন্নর মেজাজমর্জি ভালো থাকলে ওদের 'তুমি' বলে ডাকে, তখন সতু ফুরফুর বাতাস পায়, অকারণ এক আনন্দ সেই মাটকোটার খুপরিতে ক্রমে অনুজ্জ্বল আলোয় ভাসতে থাকে। এরপর সরি কথা বলে : ভাই বড় হইয়া গ্যাছে···।

সতুর দুধের দাঁত পড়ে যায়, সে এখন ফোকলা, কথা বলতে গেলে থুতু ছেটাবে।

সরির হাত ধরে সতু চাতালের পেয়ারা গাছটার তলায় গেল। ওখানে ধেড়ে ইদুরের আস্তানা। গাছটার ছালবাকল নেই, শাদা ডাল জটিল হাড়ের বিন্যাসে দীর্ঘকাল একইরকম। এ বাড়ির অনেকের দুধের দাঁত জমা আছে পেয়ারা গাছটার গোড়ায়, অন্ধকার সুড়ঙ্গে। মাটি তুলে তুলে ধেড়ে ইঁদুর নরম এক ঢিবি বুনে রেখেছে। সেই ঢিবির ওপর থানকুনি পাতার বাহার, যা আমাশায় ভোগে বলে কাকামণিকে খেতে হয়। সরি সতুর হাতটা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, ঢুকিয়ে ধরে রাখে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকে সরি। সতু দিদির মুখের দিকে চেয়ে আছে, সরি থামামাত্তর জিজ্ঞেস করে. 'কী বললি রে, দিদি?'

আমার দাঁত তোমায় দিলাম, তোমার দাঁত আমার···

মানে ?

তোর ইঁদুরের মতো দাঁত হবে, কুটকুট করে খাবি।

কেন বললি ?

বেশ করেছি, ওঠ।

আমি কি ইঁদুর ?

হ্যাঁ, শাদা ইঁদুর।

দিদি !

কী ? তবে কী তুই ?

মানুষ।

ওরে আমার মানুষ রে !

সরি পাঁজাকোলা করে সতুকে নিয়ে এসে খাটের ওপর ঝুপ করে বসিয়ে দিল। সতু তখনো সমানে গজরাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। আর এভাবে সে কাহিল হয়, শ্রান্ত তার মুখে বাইরের ধবল স্রোত দরমার ঝাপ ঠেলে এসে পড়ে। ঝিল্লির টানা শব্দও থাকে। সামান্য পোকা নীল আলো সমেত জাল বোনে, খসে যায় দু-একটা নক্ষত্র। আর সতু একরাত থেকে পৌঁছে যাচ্ছে আরেক রাতে। যখন অবশ্যম্ভাবী দিনগুলো নানান দৌরাত্ম্য, বর্ণপরিচয় আর নব-ধারাপাত এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমেত ঢোলা জোববার মতো খুলে যায়। নিতান্ত বালক বলে কোথাও হারায় সেই জোববা।

ধন বাইর কর ধন বাইর কর   তিনডা খুদের হাড়ি
জন বাইর কর জন বাইর কর   তিন মাগি রাঢ়ি ॥

এনামেলের থালাটা হাতের চেটোর ওপর বসিয়ে সরি ঘাটে গেল। ততক্ষণে অন্নর খাওয়া হয়ে গেছে। ন্যাতা বুলিয়ে অন্ন উঠতে-না-উঠতে সরি ফিরে এসেছে। চট আর সূঁচের ফোড়ে তোলা নকসি কাঁথা বিছিয়ে বিছানা পেতে ফেলে আব শূন্যে ঘটি তুলে আলগোছে জল খায় অন্ন। প্রতি ঢোকে কণ্ঠনালীর হাড় এবং শিরা খেলতে থাকে।

খাইছ ?

কোন্ আখার ছাই আছে যে তাই দিয়া খামু ? কী রাইখ্যা গ্যাছে ? বলে···

তখন অন্ন ছড়া কাটে, যাতে 'মাগি' এই শব্দটা ভয়ানক গুরুত্ব পায়। আর পেয়ারা গাছের ডাল অন্ধকারের শরীর। অন্ধকার সেই নিষ্ফলা গাছের ডালে ফাঁস। সতুদের চালায় একটা থ্যাবড়া ছায়া আছড়ে পড়ে। দীর্ঘ শীতের রাত বাড়ছে। পাশের বাড়ির চাটগাঁইয়া বিশুদের খুপরি থেকে শুটকি মাছের তীব্র গন্ধ আসছে। চন্নুর মা এই গন্ধ পেলেই জিজ্ঞেস করে, 'অ বিশুব মা দিদি কী বান্ধলেন আইজ ?'

হুটকি মাছের ঝুল আর পদিনা পাতার···

বিশুর মার ফ্যাসফেসে গলা আশপাশের শূন্যতা বিদ্ধ করে। ততক্ষণে অন্ধকার গোল হয়ে দুলতে থাকে। ক্রমে সংকীর্ণ। তিনটি প্রাণীর শরীরে পেয়ারাডালের ছায়া পর্যায়ক্রমে ঘুরে-ফিরে আসে। টিনের চালার শর্ষে-ফুটোয় শুদ্ধ শাদা রঙ। কদাচিৎ তারার ঔজ্জ্বল্য। ক্যাওড়া-পাড়ার পেছনের জলায় আর লাইন-ধারের ঝোপে জাগ্রত শেয়াল প্রহর গুণে যাচ্ছে।

অন্ন ছেলেমেয়ে দুটোকে দুপাশে নিয়ে শোয়। আর শুলেই সমগ্র দিনের ধকল, ঝঞ্ঝাট, সে ক্রমে ভুলে যেতে থাকে। শরীর নরম। এক-প্রকার নীল মায়া তখন ঐ চল্লিশোর্ধ্বা শরীরের দখলদার। সন্তু মার বুকের কাছে মাথাটা কাত করে রেখেছে। অন্ন কোনো কথা বলে না কিন্তু তার শ্বাস এবং মৃদু আন্দোলিত হাত জানায় যে অন্ন জেগে আছে। জেগে থাকছে। সন্তুর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি তখন কেবলমাত্র দুটি কান তীব্রতর সজাগ করে রাখে। সে অন্নর মুখে কিছু একটা শুনতে চায়। আর স্তব্ধতার ঘন আনন্দ বয়ে যেতে থাকলে অন্ন হঠাৎ কিছু একটা দিয়ে শুরু করে। যাতে সুখ, সম্পদ বা বৈভবের কথা থাকে। ভবিষ্যৎ এক দূরগামী মেলট্রেন চেপে সশব্দে প্রায় এসে যায়। অন্নর সন্তানাদি তখন তারই শরীরে আগত হয়ে থাকে। আজ সন্তু নিজেই হঠাৎ মার গলা জড়িয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে, 'আমি দেশপ্রিয় ইস্কুলে ভর্তি হবো মা!'

অমা! অ্যাতোদূরে একা-একা যাবি ক্যামনে!

ক্যানো? দুলুর সাথে যাব।

ম্যালা টাকা পয়সার কাম, আমরা গরিব মানুষ কই পামু?

ক্যানো? আমরা গরিব ক্যানো?

জানি না, অ্যাতো কথা তো জানি না। গরিব, গরিব···ব্যাস।

ক্যানো?

জ্বালাইস না কইলাম।

বলো না?

আইচ্ছা বিপদ হইল, অ সরি শোনস নি সন্তু কী কয়!

সরি তখন সন্তুর থোকা চুলে কয়েকটা আঙুল ছেড়ে দিয়েছে, অনায়াসে খেলা করে সেই আঙুল। অন্ন দরমার খোপকাটা জানলার ভেতর দিয়ে রেল লাইনের দিকে জল-চোখ মেলে বিড়বিড় করে: তর বাবায় নাই কিনা তাই। হেই মানুষটা থাকলে আমাগো কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট!

বাবা কবে ফিরবে?

ফিরব।

বাবা ফিরছে না ক্যানো ?

ম্যালা কাম, তয় ফিরব, নিশ্চিত ফিরব।

তারপর তারা তিনজন সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটা সম্পর্কে আলোচনা করে। সতু এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। সরি তার স্মৃতি থেকে সন্দেশ খাওয়ার আর ঝলমলে ফ্রক পাওয়ার গল্প বলে। আর এভাবে সতু বাবার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নিতে থাকে, অস্পষ্ট, ধোঁয়া-ধোঁয়া জায়গায় তার নিজস্ব অনুমান ও কল্পনা। ক্রমে সে তার বাবাকে একান্ত নিকটে পেয়ে যায়। তার কেমন একটা আশা হতে থাকে বাবা ফিরে এল বলে। অন্ন এই সুখের স্মৃতিচারণায় অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে, আর সতুর হঠাৎ মনে হয় পাইপপাড়ার সেই ছেলেটার কথা। ওরা বাবা-মা, ভাই-বোন সমেত পাইপের ভেতর থাকে। ওদের তো বাবা আছে তবু ওরা গরিব কেন ? ওদের তো বাবা আছে তাহলে ওরা পাইপে থাকে কেন ?

সতু অন্নকে ঠেলল। অন্নর সাড় নেই। সারাদিনের ধকলে অন্ন এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সতু এপাশ-ওপাশ করে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে ; আর এক নির্দয় স্বপ্ন তাকে টেনে নেয় সেই পাইপের ভেতর। অন্ধকারে, স্বল্প-বাতাসে, তার দমবন্ধ হয়ে আসে, সে ছটফট করে। বেরিয়ে আসতে চায়, ক্রমাগত হামা দিয়ে চলে কিন্তু কিছুতেই পাইপের সেই মুখটা পায় না যার পর ছিন্ন আকাশ পাখির পালক।

অ্যাই সতু, কী হইল ভাই, অ সুনা, বোবায় ধরছে, পাশ ফিইরা শো!

সতু পাশ ফিরে শোয়।

ল্যাখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘুড়া চড়ে সে।

চিক্কইর দিয়া পড়, জানি কতকাল খাস না, জানি শুকাইয়া আছোস।

কথাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে অন্ন চলে যায়, সতুর দিকে তাকায় না। আর এই সমগ্র কাণ্ড ও কয়েকটি মুদ্রার মধ্যে অন্নর ব্যগ্রতা স্পষ্ট। সে দুদ্দাড় ঘাটে চলে গেল। শুকনো পেয়ারা পাতার শব্দ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। সতু তখন ভুলে চলেছে—তালব্য 'শ' আর 'ঠ', 'শ ঠ অ···শ আর ঠ···শ···অ···ঠ···অ···শঠ'···মানে? আবার মানে? শঠ মানে কী? সে ফ্যালফ্যাল করে চারদিক এমনভাবে দেখে যেন সে এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবে, শঠ কে। আর এই দুটি অক্ষর, তাদের মিলিত উচ্চারণে কী জাঁক! যেন মেলাই পোশাক পরা বেঁটেখাটো কোনো মানুষ, চ্যাপ্টা নাক, ভয়ংকর গম্ভীর···। শঠ মানে কী? অন্ন নেই। ঘাটে গেছে। আর থাকলেও কি জিজ্ঞেস করা চলত? মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে আছে। কনকনে ঠাণ্ডা একটা ভাব ধোঁয়ার মতো উড়তে থাকে। অন্নর তখন কান্না পায়, অন্নর কান্না পাওয়াটা বমির মত বুক ভেঙে উঠে আসে। আর কান্না পাবে নাই-বা কেন? সকাল থেকে এত বেলা হয়ে গেল, সে সতুর মুখে একখানা শুকনো রুটিও তুলে দিতে পারে নি। উল্টে তাকে বলতে হয়েছে, 'গলায় আওয়াজ নাই দেখি···জানি শুকাইয়া আছোস!' এ যে অন্নর কী কষ্ট তা সতুও বোঝে। সতু আরো টের পায় তার দিকে মার যত টান দিদির দিকে ততটা নয়। নাহলে সরিও তো সেই কোন সকালে বাসি মুখেই বেরিয়ে গেছে শাক পাতা লতার খোঁজে। আর সতুর থোকা চুলে আঙুল চালিয়ে অন্ন বলবে, 'সুনার আংটি আবার বেঁকা!' সতু তখন ভেবেছে—দিদি কি ফ্যালনা? দিদি কি মানুষ না? অন্ন বলে: মাইয়া মানুষ/মাইয়া সন্তান···

মাইয়াসন্তানের অ্যাতো জেদ ভালো না!

মাইয়ামানষের অ্যাতো জেব্বা কিসের।

সরি ক্রমাগত পেছনদিকে সরে যাচ্ছে দুধের লাইনে, ক্যাওড়াপট্টি ছাড়িয়ে জোলো মাঠে সরির এক বেণী হারায়, যেখানে সে কোমর ভেঙে কলমি অথবা হেলেঞ্চার সন্ধান করবে···কচুর লতি কিংবা খারকোল পাতা খুঁজে আনবে 'অমা দ্যাখো আইসা কতডি লতি!'

হইছে, হইছে···অখন ছান্ কইরা উদ্ধার করেন দেহি; ক্যাবল

পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে পারলেই হইল নাহ ? লাজ নাই···লজ্জা নাই ···এই মাইয়ার জন্য মাথা কাটা যাইব···বিক্কিরি বসতে হইব···আইচ্ছা জব্দ কইরা গ্যাছে আমারে !

অন্ন ঘাট থেকে ফিরল। চুলের গোছা কপালের বিনবিনে ঘামের সঙ্গে লেপটে থাকায় দু-এক গাছা শাদা সুতোও মালুম হয়। সামনের উঁচু দাঁতটার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। দুমদাম শব্দে সে কাজ করে যেতে থাকে। উবু হয়ে ঘর মুছতে গিয়ে খাটের নীচে ঠোক্কর খায় একবার। আর তখনই সত্তু সেই বমির বেগটের পেল, আদতে যা কান্না। অন্ন যেন এক্ষুনি সেই কান্না পেট আর বুক থেকে টেনে এনে পিত্তি সমেত ঢেলে দেবে কাঁচা মাটির ঘরে, দেয়ালে।

সরি গেছে কানাইমাস্টারের ক্লাবে। সেই সক্কালবেলা গেছে এখনও ফেরার নাম নেই। ক্লাবে দুধের জন্যে যে লম্বা লাইনটা পড়ে সরি সেই আঁকাবাঁকা লাইনের ধাক্কাধাক্কিতে ক্রমশ ক্লান্ত হবে। সরির খিদে পাবে। আর লাইনটা একটু একটু করে এগোবে। খিসতি খেউড় আর বদরাগি কানাইদার চড়চাপড় সইতে সইতে লাইনটা এগোয়। দুধের সেই লাইনের হাতে থাকে হিজিবিজি কাটা হলুদ কার্ড; দুধ মেপে দেওয়ার আগে কানাইদার ক্লাবের ছেলেরা খস্‌খস্ করে কার্ডে দাগ দিয়ে দেয়। একবার ঐ দাগ পড়ে গেলে কেউ আর ঠকিয়ে দু-বার দুধ নিতে পারবে না। তবু ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, চেষ্টা করতে গিয়ে মার খায়। হাতের সুখ মিটিয়ে কানাইদা মারে। একবার সরি ফিরে এসে বলেছিল, 'কী কাণ্ড জানো মা ! মিলিক পাউডার তো গরমেন্ট বিনা পয়সায় দেয়··· তা হইছে কি মিলিক পাউডারের ব্যাগ আইলেই ওরা আদ্দেক নাকি বেইচা দেয়।' সরির ফিরতে বেলা হয়, সরি ফিরলে অন্ন চা বানায়। সত্তু জিজ্ঞেস করে, 'শঠ মানে কী।' সরি কোনো উত্তর দিতে পারে না, সে কেবল দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রাখে, 'কালুর মায় র‍্যাশন ছাইড়া দিতাছে ···টাকা থাকলে···' অন্ন কোনো জবাব দেয় না।

সত্তু নিশ্চিত যে সকালে একখানা গোলা রুটিও জুটবে না, একটু পরেই অন্ন তাড়া লাগাবে, 'সত্তু নাইতে যা'। আর এখন সে পূর্বাপর

ামস্ত বুঝে চীৎকার করে পড়তে থাকে, 'অ, চ আর ল···অচল, অ···ধ অ আর ম···অধম।'

সতুর এত চীৎকার কেবল অন্নকে খুশি করার জন্যে। মাকে খুশি করার কেমন একটা লোভ আছে, লোভ হয়। বিশেষ যখন চন্নুর মা বলে, দেইখেন অন্নদি, পোলায় আপনের ভালো হইব···হগল দুঃখ ভুলাইব, কি রে সতু কথা কস না ক্যান?' সতুর তখন বস্তুত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না, তখন সেই লোভ ছিন্নভিন্ন। আনন্দে গলে যেতে থাকে সে। কেমন লুলা হয়ে যায়। আর একটা কথা কেউ-না-কেউ বলে, 'ল্যাখা-পড়া করে যে···।' যে বলে কখনও সে রণর বাবা, কাকামণি কিংবা চন্নুর দাদু। তারা যে খুব একটা বিশ্বাস করে তা নয়, তবে কেমন একটা আমোদ আছে। কোথাও স্ফূর্তি হয়। সতু স্বপ্নে পটু নয়। অন্নর হা হুতাশ এবং এমন অনেক সম্ভাবনা অযথা বিনষ্ট হতে শুনেছে যাতে অন্ন স্বস্তির আশা করেছিল। ফলে সে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে সে বড় হচ্ছে, পুরোদস্তুর মানুষ হচ্ছে। এবং চাকরি করে টাকা এনে দিচ্ছে অন্নকে। যেমন সকলে ভাবে, অথবা বলে। কোথায় যেন তার বিশ্বাস হয় না।

ঢাকের বুকে কাঠি বাজে। বারোয়ারিতলা, কাঠগোলা, নতুন কলোনি আর পাঁক-পচা ডোবা পেরিয়ে ক্যাওড়াপট্টি তক ঢাকের গুড়-গুড়, গুড়-গুড়, শব্দের প্রতিধ্বনি হয়।

···ট্যাং টা···ট্যাটাং···ট্যাং টা···ট্যাটাং এই শব্দ অবোধ অপোগণ্ড বালক-বালিকার এক ঝাপটা বইয়ে দেয়। বিভিন্ন দিক থেকে কাদা ভেঙে, খোয়ায় পা কেটে ইজের আর ফ্রকের পেছনে ধুলো লেলিয়ে তারা আসতে থাকে, ছুটতে থাকে। ঢাকের এই শব্দ যেন ডাক, আহ্বান। যেমন বিহারি রামসেবক কালো কাপড়ে ঢাকা সিনেমার বাক্স নিয়ে এলে হয়। সে ঘণ্টা নাড়তে থাকে। আর সেই শব্দে গরিবগুরবোর ঘরে দু-একটা তামার পয়সার জন্যে শিশুরা চঞ্চল। অযথা মার খায়, আর কয়েকজন ভাগ্যবানের সামনে পেতলের ঢাকনা খুলে গেলে নিরুপায় অন্যান্যরা হুমড়ি খায়। কখনো হাতাহাতি হয়। আর বৎসরান্তের এই ডাক যখন লাইন ধারে কাশের বনে ছেঁড়া মাতাল তুলোর হুটোপুটি

ছড়িয়ে অকস্মাৎ ঢাকের বোল তখন ঢালা এক রাঙা উৎসব শিশুদে
ধমনীতে স্রোত আনে। সেই শব্দ বুকের ভেতর জটিল ধ্বনির আবর্ত।

থুথ্থুড়ে ঘোড়া নিমগাছের থ্যাবড়া ছায়ার জড়ভরত গুঁড়ি ছুঁয়ে প্যাণ্ডেল। এবার নিয়ে বারোয়ারিতলায় পুজোর একশত বর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। প্রথম পুজোর চল করেছিল কানাইদার দু-পুরুষ আগে ছানুবাবু, তখন বলা হত ছানুবাবুর পুজো। ছানুবাবুর এখানে বিশাল বাগানবাড়ি ছিল, ছানুবাবু ভবানীপুরের মিত্তিরদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন দশ টাকার নোট লাগিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন। পায়রা ওড়াতেন, গোঁফে আতর মাখতেন। কানাইদাদের বাড়িতে ছানুবাবুর ছড়ি এখনও সযত্নে রক্ষিত।

তেরপলের পর্দা টাঙিয়ে দুর্গাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। ষষ্ঠীর দিন উন্মোচন করা হবে দুর্গার পর্দা। অন্নু বলে, দুগ্গা পরতিমা। কখনও কখনও কেবল 'পরতিমা' বলে। ঢাকের শব্দে সতুর মা-র কথা মনে পড়ে পরতিমার পানপাতার মতো ভরাভরা-মুখ ভাসতে থাকে। নতুন জামা আর গ্যাস বেলুনের অনুষঙ্গ আসে। ঢাকের বোলে মোষের কাটামুণ্ডু ড্যাবড়া চোখ ভেসে ওঠে, যে কারণে দুর্গাঠাকুরের নাম মহিষাসুরমর্দিনী আর দু-এক দিন আগেই মহালয়া হয়ে গেছে। চন্নুর দাদু কালীঘাটের গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়েছিল। আর অন্নু মহালয়ার দিন সারা সকাল অকারণে বিমর্ষ ছিল। একবার সতুকে গালমন্দ করে, 'যাওনের সময় আমারে বাঁশ দিয়া গ্যাছে···জানিনা যা আছে খা গিয়া···তিনি তো তাঁর বাদ্যি বাজাইয়া গেলেন, অ্যাহন তুই মাগি জ্বইলাপুইড়া মর··· এই ছাওয়াল তখন প্যাটে···বোঝেন অবস্থা···।

সতু প্রতিমার মুখ দেখতে পেল না। ক্যাওড়াপট্টির ছেলেদের পেছনে ভিড়ের ভেতর লুকিয়ে-ছিপিয়ে থাকল। কানাইদা যে সামনেই, আর যদিও এখন চাঁদা তুলে বারোয়ারি পুজো তবু কানাইদার হম্বিতম্বি বেশি। ফসফস করে সিগারেট টানছে কানাইদা, হুকুম করছে। কী যেন ভেবে হা হা করে হেসে উঠল কানাইদা. প্যাণ্ডেলওয়ালা জড়সড় কানাইদা যেন ভগবানের মতো। কানাইদা ইচ্ছে করলে কী না পারে

প্যাণ্ডেলওয়ালাকে আগাম টাকা দিতে পারে, দুর্গার পর্দা তুলে দিতে পারে, সন্তুকে কাঁধে তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারে, এবং ইচ্ছে করলেই আবার লুফে নিতে পারে। কানাইদা রাজা। সুলতান আলম স্ট্রিটের চাপা গলি, ভাঙা সাঁকো, কিছু বৃক্ষ, জলাশয় এবং বরফকল সমেত তামাম এলাকায় কানাইদা রাজার মতো। সুলতানের মতো, প্রকৃতই সুলতান। এই একে চাবকে সিধে করে দিচ্ছে, অমুকের টেম্পোরারি ছুট কাজের তদ্বির, তমুককে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে জুড়িয়ে দিচ্ছে। রামাশ্যামাকে প্রশ্রয় দিয়ে উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে। কানাই-দার মুখের একটা কথায় তারা গুম খুন করতে পারে। একবার করেছিল বলে শোনা যায়।

মণ্ডপের সামনেই যেহেতু সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরি হচ্ছিল সেজন্যে সন্তু তার ক্ষুদ্র শরীর ভিড়ের ভেতর বিশেষ কায়দায় চালান করে। নচেৎ কানাইদার হাতের চাপড় সইতে হত। কানাইদার সন্তুর ওপর খুব টান, কথায় কথায় চাপড় লাগায়। সেই কানাইদার ভিট কপাল একেবারে সামনেই। এখন সে কী করে? পালাবে? তা হলেও তো কানাইদা দেখতে পাবে, আর দেখলেই প্যাঁদাবে। চন্নুর মা বলে—শনিঠাকুর। তেজে অস্থির। সন্তুর তাই কানাইদাকে দেখলেই ভগবানের কথা মনে হয়। আর ভগবানে সন্তুর বড় বিরক্তি, রাগ। অন্ন কত ডাকে, ভগবান তবু দুঃখ ঘোচায় না। অন্ন কাতরায়—ঠাকুর আর তো পারি না। সন্তুও মানত করেছে, হে ভগবান, বাবুকে এনে দাও (বাবাকে 'বাবু' বলাটা সন্তুর সরির কাছ থেকে শেখা)। বাবাকে সে কখনও দেখে নি, বাবার কোন স্মৃতি নেই তার। কেবল কিংবদন্তীর গল্প আছে বাবাকে ঘিরে। সন্তু বাবার জন্যে ভগবানকে বলে-বলে হয়রান হয় এবং শেষমেশ গাল দেয় কারণ ভগবান শোনে নি। শালা। হারামি।। শালাহারামি।

সন্তু আরও গালাগালি জানে। একবার অন্নর সামনে কী একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলায় ঠেঙানি খায়। এবং অন্ন তারপর স্বভাবজ বিলাপে মগ্ন থাকে ; যে বিলাপ তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে শোকের ঝাণ্ডা গেড়ে দেয়। রাতে অন্ন খায় না, 'হা ভগমান কপালে এইয়াও ছিল ...

ছুটোলোকের সাথে মিশ্যা'···

ক্যাওড়াপাড়ার গলুদের এ-সব বালাই নেই। গলু রাগলে যা তা বলে, ক্ষেমিপিসির মুখ তো একেবারে পাশ করা। আর সত্নুর যেন রাগ নেই, সে যেন মানুষ নয়। অন্ন এই বৃত্তান্ত জানে বলেই গলুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। বলে, 'ল্যাখে না পড়ে না, অর সাথে তর বন্ধুতা কিসের শুনি! অগো আর কি, উইড়া আধার খাইতে শিখলেই হইল। আর তর? তর চলবো নি?'

সত্নু ঠিক বোঝে না অন্ন কী বলতে চায়। এমন-কি এখনো পর্যন্ত সে লেখাপড়ার আবশ্যকতা তেমন বুঝে উঠতে পারে নি। কেবল ভবিষ্যতের ধোঁয়া-ধোঁয়া যে নক্সা অন্ন বুনে রাখে, সত্নু এটুকু বোঝে সেখানে পুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সে নিজে সেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারে না বরং গলুর দিগম্বর মূর্তি ও হাতের গুলতির নিশান অব্যর্থ বোধ করে, সেজন্যে তাকে ভাবতে হয়, ধুস্ পড়লেই যেন হল! পারবে কেউ গলুর মতো উড়ন্ত বেলেহাঁস এক টিপে মারতে? ঝপ্ করে কাঁকড়ার দাঁড়া ধরতে? গলু সব পারে। এমন-কি গলু রেললাইন ধরে যাদবপুরের রাস্তা চেনে, সত্নুকে নিয়ে যাবে বলেছে। সত্নুর কাছে গলু নায়কের মর্যাদা পায় সে নিজেকে মনেপ্রাণে গলুর চেলা ভাবে।

কানাইমাস্টারের চোখ এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে-খেতে সত্নুর মুখের ওপর দাঁড়ায়। ঢাকের আওয়াজ আর সমানে নাচের ছাঁদ তখন বারোয়ারি তলায় মজা ওড়াচ্ছে। নাচের একেকটা মুদ্রায় যুদ্ধের, আক্রমণের ভাঙা ছায়া থাকে। কদিন এই লোকটা বাড়ি-বাড়ি পালা করে খাবে, পুরনো কাপড় আর খুচরো পয়সা তুলবে। গতবার চন্নুদের ওখানে একবেলা খেয়েছিল। চাষবাস, পালাপার্বন আর দেশগাঁ গেরস্থালির গপ্পো করেছিল, গাঁয়ে নাকি অভাব, দারুণ অভাব। আর বলেছিল সিমলার বাবুদের কথা, একবার বাজিয়েছিল সিমলায়, কিন্তু এক পয়সা ঠেকায় নি, উল্টে নাকি মেরেছিল। আর তবু সে বাবুদের পুজোয় এসে পড়ে ঠিক, বাজায়—ট্যাং টা টাটাং ট্যাংটা··· । বাজনার

এরকম মানে করে নেয় সন্তু, গলু, রণ : ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

কী রে ছোঁড়া!

কানাইমাস্টারের ড্যাবডেবে চোখ সন্তুর মুখে ফোকাস মারে।

ইস্কুল যাচ্ছিস না কেন?

বই কিনে···

সন্তু কী একটা জবাব বানানোর চেষ্টা করে, আসলে সেই ভিড়ের মধ্যে সন্তু ফাঁকফোকর খোঁজে। আর হঠাৎ সে ক্ষিপ্র শরীরটা গলিয়ে দেয় এক বৃদ্ধার পাশ দিয়ে এবং ছোটে যেন দিগন্তে নিক্ষিপ্ত ঢিল। পেছনে সদিবসা গলার গম্ভীর হাসি ফেটে পড়ে, 'কী হল রে! অ্যাই ছোঁড়া!'

সদর দরজা দিয়ে ঢোকার ভরসা পায় না। কারণ সে চটপট মিথ্যে কথা বানানোয় ওস্তাদ নয়। এ কাজটা সরি ভালো পারে, এমন মুখের ভাব করবে যে বোঝার জো থাকবে না। সরি অনায়াসে, অকারণে গাদা গাদা মিথ্যে বলে, মিথ্যে বললে সরির ভাল্লাগে, সুখ হয়। দ্রুত এত কিছু ভেবে নিয়ে সন্তু বাড়ির পেছনে ভুবন্সা কুলগাছটার সামনে এসে থামে। এই কুলতলায় সর্বক্ষণ যে ভেজা ছায়া থাকে সেখানে হঠাৎ চলে আসা সন্তুর পুরনো অভ্যাস। লিকলিকে একটা ডাল ধরে সে হাঁপায়। ঢাকের শব্দ, বাজনদারের বিবিধ মুদ্রা, আর সমবেত উল্লাস এমন কি এখানে এই কুলকাঁটায় বিদ্ধ হয়ে আছে। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেইসব সূক্ষ্ম রেশম সুতো ছিঁড়ে যায়, খামকা ট্রেন আসে। সবুজ ট্রেন আসছে ইস্পাতের শব্দ তুলে, সিটি বাজে, আর কাঁপতে থাকে তলতা বাঁশের তুচ্ছ গৃহ। ঘ্যাস-ঘ্যাস ঘিস-ঘিস শব্দ সন্তুর তাবৎ আচ্ছন্নতা কচু কাটা করে, যেন সে মারা পড়ে, কাটা যায় লাইনে। ফায়ারম্যানের উড়ন্ত রুমাল সে দেখেও দেখে না। কেবল মনে হয় যদি ওই ট্রেন ক্যাওড়াপট্টির ডোবার ধারে না থামে, বাক্স প্যাঁটরা সমেত কাঁচাপাকা চুল উড়িয়ে একজন মানুষ সন্তুদের বাড়ির দিকে যদি না হেঁটে আসে তাহলে সে, সন্তু কি বেঁচে থাকবে? বাঁচবে?

সতু কেবল বয়লারের আগুন দেখে, দেখে বয়লার থেকে বাতাসে লাফ দিচ্ছে আগুন। সিগন্যাল বদল হয়, সবুজ ট্রেন থামে না।

অন্নর কাছে শোনা, সতুর মুখটা বাবার মতো। একেবারে কেটে বসানো। আর বাবার কথায় তার আশ্চর্য গর্ব। বাবার জন্যে সতুর গর্ব হয়। সতুর বাবা দেশের জন্যে লড়েছিল, যেজন্যে আই. এ. পাশ করা হয় নি, চাকরি করা হয় নি, অন্নকে ভ্যাসাল সংসারের তিরিশখান পাতের জন্যে দুবেলা ডেকচি খুন্তি নাড়তে হয়েছে আট মাসের গর্ভ সমেত। অন্ন যখন এ সব গল্প বলে, ঠিক বোঝা যায় না এই স্মৃতি কি তার কাছে কেবলই দুঃখ, ধোঁয়ার প্যাঁচ, নাকি কোথাও গর্ব আছে, আনন্দ আছে। সতু দেখেছে বাবার কথা উঠলেই অনেকে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়, 'আহা, বেচারা বুঝলোনা বাপ কী বস্তু!' বা, সেই তাকানোয় কখনো ইঙ্গিত থাকে এরকম: অমন বাপের ছাওয়াল! আর সে তো মার মুখেই কত শুনেছে। পিকেটিং। বিলাতি জিনিসের দোকানে আগুন। লবণ আইন অমান্য। কলাগাছের গোড়া কেটে সেদ্ধ করা। আর আগুন। পিকেটিং। ভারত ছাড়ো। বন্দে···ই মাতরম্। বন্দে এ···এ···। মা···আ···ত···অ···র···অম্! আর আগুন। অন্নর কাপড়ে। কপালে। আগুন।

সেই দ্যাশ স্বাধীনতা পাইল···মানুষডায় দ্যাখলো না —অন্ন বলে। আরও কত কথা···সব মনেও থাকে না। ফরিদপুরের কালেক্টারকে ধরে পদ্মায় চুবিয়েছিল। 'ইংরাইজ খ্যাদানোর লড়াই···তর বাপে ছিল হগলডির মাথা। পান থিকা চুন খসলেও হগলডি 'কালাদা' 'কালাদা' কইরা পাগল করতো···এবং এসে যেত জাতীয় ইতিহাসের আরেকটি উজ্জ্বল কাহিনী···

···একবার হইছে কি হকালবেলায় দারোগা আইসা উপস্থিত··· আগের দিন কোনহানে জানি ঝাণ্ডা তুইলা আইছিল···দারোগার শব্দ পাইয়া হগুরে তো পোলারে টাইনা নিয়া হোগলার বেড়ার পাশে লুকাইয়া রাখছে···আর দারোগায় যেই না বাড়িতে পাও দিছে হ্যায় করছে কি···হোগলার ফাঁক থিকা চিক্‌খইর দিয়া উঠছে, 'বন্দেমাতরম্'···

হ্যাশে আর কি !

ইংরেজ নাকি চলে গেছে। তবু বাবা ফিরছে না। কেন ফিরছে না? বাবার নামে ইংরেজ আমলে হুলিয়া ছিল। এখনো কি বাবার নামে হুলিয়া আছে? 'বাবু তুমি ফিরে এসো' সবুজ ট্রেনেব জন্যে সতু এই শব্দ কটি ঝুলিয়ে রাখে। অথচ ট্রেন থামে না, অদ্যাবধি কোনো ট্রেন থামে নি, কে বা কারা নিষ্ঠার সঙ্গে বয়লারে কয়লা মারে। তাদের হাতের রগ আর আগুনের ফুলকি ঝলসায়। আর সেই আগুন গিলতে গিলতে সবুজ ট্রেন সিগন্যাল পেরোয়। কেবল জলো দুনিয়ায় ইঞ্জিনের যাওয়া শব্দ কিছুক্ষণ নিঃসঙ্গ কাঁপতে থাকে—ঘ্যাস-ঘ্যাস-ঘ্যাস।

এখন, এই কুলতলায়, ভেজা ছায়া বড় কষ্টের। সকালের ফ্যাকাশে আকাশ পুরনো ঘুমে ঢিলে হয়ে আছে, অনেকটা নেমে আসা সেই শাদাটে আস্তর অবধি টেলিগ্রাফের পোস্ট, বড় বেশি ঋজু। পোস্ট ছেড়ে মুহূর্তে উড়ে যায় ছিন্ন-ভিন্ন তুলো, পাখির শরীর। কুট্টিবোনের লুকনো বালার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। সরি বালাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল, আর কুট্টিবোন সম্পর্কে দু চারটে কথা আপনিই এসে পড়ে, অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবায় তখন দানা দানা অন্ধকার জমছে। দু একটা জোনাক পোকা সেই অন্ধকার ফুটো করে যেতে থাকে।

সরি!

কী ই ই।

হাত ম্যাল।

কী!

হাত ম্যাল কইলাম!

ক্যান?

কথা বাড়াইস না!

কী···ই।

হারামজাদি হাত ম্যালোস কি না···

অন্নর হাতের থাবায় উঠে আসে সরির রুক্ষ চুল আর লোহার একটা বালা। মুহূর্তের স্তব্ধতা, তারপর ফিকে অন্ধকার আর জোনাক পোকার

নীল আলোকবিন্দুর দিকে ছুটে যায় কুট্টিবোনের স্মৃতি। সরি কাঁদতে থাকে যেন এইমাত্র কুট্টিবোন মারা গেছে, সৎকার হয় নি। আর সন্তুর এখন মনে হয়, কুট্টিবোনটা বোকার ডিম! কেন যে মরল!

সে কি জানত না সবুজ রেলগাড়ি চেপে পুজোর ঠিক মুখে একগাদা কোরা কাপড় নিয়ে বাবা ফিরে আসবে?

প্র: ১ সের দুধের সহিত জল মিশাইয়া ৫ টাকা সের দরে বিক্রয় করায় গোয়ালা ৬ টাকা পাইলে দুধে কত সের জল মিশাইয়াছিল ?

গোটা-গোটা অক্ষরে অঙ্কটা বোর্ডে আঁকা ছিল। বিনে পয়সার ইস্কুলে শিক্ষকের চেয়ার শূন্য, টেবিলে একটা ডাস্টার। ভগলু টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠুকছে বলে চকগুঁড়োর একটা স্রোত দরমা আর টালির ঝুপড়ি উজোয়। শাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে সরু হাড়ের কাঠামো, ইজের আর গেঞ্জির ভেতর ধামসায় বুকের খাঁচা, মারামারি করে—বোর্ডের অঙ্ক চুপচাপ সব দেখে যায়। পেনসিল কিংবা খাতা কাড়াকাড়ি, ধস্তা-ধস্তি, বুনোকুলের লালা-মাখা বিচি ছোঁড়ে কেউ। যখন এই অঙ্ক, তার ভাষার সাধুত্ব, সতুর সামনে এক অবশ্যম্ভাবী ফল ঝুলিয়ে রাখে—শরীরের বিশেষ এক মুদ্রা, বা ভঙ্গিমায় তাকে ব্যাঙ হতে হচ্ছে। কারণ তাকে আর পাঁচটা ছেলে থেকে আলাদা করা হয়, কারণ ক্যাওড়াপাড়া কিংবা কাঠগোলা বস্তি, নতুন কলোনির একটা ছেলে যাহোক কিছু করে খাবে, কারণ সতু ভদ্রলোকের সন্তান। তার মা কানাইদার হাত ধরে বলেছে, 'প্রাণটুক রাইখ্যা কানাই য্যামনে পারো।'

সুতরাং ভেজালের অঙ্কটা হয় তাকে মিলিয়ে দিতে হবে, না হলে মায়াবী রাক্কোস লীলাচ্ছলে আঙুল নাড়া মাত্র সে ব্যাঙ হয়ে যাবে। ফলে অঙ্কটার বয়ান নিয়ে সে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, আর ঘামতে থাকে কারণ চূড়ান্ত সেই মুহূর্ত এসে গেল প্রায়…এবং সত্য এই যে দুধ ও জলের সম্পর্ক নিয়ে কোনো নৈতিকতায় সে পীড়িত নয়। ভালো করে বুঝেও উঠতে পারে নি। আসলে তাকে যেটা করতে হবে তা হল মেলানো, যেহেতু অঙ্ক মাত্রেই মিলে যাবে। যেভাবে হোক মিলবেই। অর্থাৎ ছ টাকার ভেতর কতটা পরিমাণ দুধ (জল + দুধ) পাওয়া সম্ভব সেইটে তাকে বের করতে হবে। কিন্তু যা দেওয়া আছে তা হল তিন

টাকায় ঐ মিশ্রিত পদার্থ কতটা পাওয়া যায় এবং আদতে দুধের পরিমাণটা। যা নেই তা হল জল এবং জলমিশ্রিত দুধের পরিমাণ।

আর সেখানেই সমস্যা, দুটোর একটা তো অন্তত বলে দিতে হবে, না হলে ৬ আর ৩ এই সংখ্যা দুটো দিয়ে ছাই···তার সমস্ত ভাবনা অঙ্কটাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে-খেতে এক সময় স্তম্ভিত, সে তখন ব্ল্যাকবোর্ড দেখছে যা অসীম কালো। স্থায়ী শোক। আর ডাস্টার, দুটি মাত্র ব্যবহার সম্ভব যে বস্তুর, এক তো বোর্ডের কালো রঙটি শানিয়ে নেওয়া, দুই সন্তুর ঘিলু অবধি নড়িয়ে দেওয়া। চ্যাটাই, চেয়ার আর কানাইমাস্টার সমস্তই যেখানে এক চৌকো খুপারর ভেতর ঐ অঙ্ক সমেত ইস্কুলের রূপক, তা কেবল সন্তুকে শায়েস্তা করার জন্যে। আর এতে সে আরও ঘাবড়ে যায়। তখন ভয়। ডাস্টার ঠোকা হয় পুনরায়। আকাট মূর্খ তিরিশটা ছেলে পুতুল।

পিনড্রপ সাইলেন্স।
সমস্তই নীরব তখন।

সন্তু অনিবার্যত ব্যাঙ হয়, পুড়ে যায় গভীর শংকায়। কারণ তার জানা নেই মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে কে কবে তাকে ফের মানুষের আকৃতি দেবে, মানুষ বানাবে। আদৌ যদি কেউ না করে, তাকে কি আজীবন ব্যাঙ থেকে যেতে হবে!

একসময় হুড়মুড় করে ঘাড়ে ছুটির ভাঁপ লাগে, ঘন্টি নাড়া হয়, কোথাও হো হো শব্দ গড়ায় জলস্রোত। ধুলোয় হুটোপাটি করে কয়েকটা ছেলে, তাদের বুকে পিঠে রোদ লাগে। পেছনে সুরকির গুঁড়ো ওড়াউড়ি করে। এসময় ঘরে অন্ন কিংবা সরি থাকে না, থাকে খিদের চোট। রুটি গুড় নিয়ে সন্তু বসে গেছে। তারপর সন্ধের অপেক্ষা।

কীরে!

উঁ।

অ্যাই সন্তু!

কী।

কী কচ্ছিস রে!

বস্তুত সে কিছুই করছিল না। কুলতলার ভেজা ছায়ায় তার শরীর, সেখানে যে-কটি বক্র রেখা, ভাঁজ, সে সবই আলস্য। তবু রণর মামুলি জিজ্ঞাসাও তাকে চিন্তিত করে। যেন কিছু একটা করছিল, কিসে যেন বেজায় ব্যস্ত ছিল। যেজন্য ক্লান্তি। রণর আচম্বিত ডাকে কিছুটা স্তম্ভিত। সেরকম বুড়োমি থাকে। নিষ্ক্রিয় বসে থাকা সত্ত্বেও টুকরো কথা ধামসেছে তাকে। ঘটনা আর প্রাচীন স্মৃতি। সবটাই কেমন স্বয়ংক্রিয় বলে রণর জিজ্ঞাসায় এই বিপত্তি।

বিকেলের দিকটায় এ পাড়ায় কোনো খেলা হয় না, দল বেঁধে যারা হাডুডু খেলে তারা বিড়ি খায় এবং গলু, সতু ও রণরা মাঠে গেলেই মেরে তাড়ায়। ফলে হয় নিষ্কর্মা বসে থাকা, নয়ত দু-তিনজন মিলে কোনো খেলা আবিষ্কারের চেষ্টা এবং শেষটায় ঝগড়া করে তারা ফুরিয়ে ফেলে বিকেল।

রেলগাড়ি কখন যে চলে গেছে সতু জানে না। রণ পেছন থেকে ঠেলে দেওয়াতে অনড় এই অবস্থা ভাঙে, যেন বা কাচপাত্র। সে হেসে ফেলে বলে ফোকলা মাড়ি দেখা যায়। অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ঘোলাটে জলে তখন চুনোমাছের দেয়ালা, মাথার ওপর রুপোর স্রোত, সামান্য দাহ। রণ সতুর হাতে একটা হ্যাঁচকা টান লাগায়, 'চ!'

কোথায়?

চ না!

আরেকবার জিজ্ঞেস করার আগেই রণর টানে তাকে ছুটতে হয় এবং শংকা থাকায় জিজ্ঞেস করে—তোর বাবা নেই তো। 'থাকুক গে', সতু আর রণর হাতে-হাতে যে শিকল তৈরি হয়েছিল মোক্ষম টান পড়ে সেখানে। ফলে হাঁফাতে হয়, কারণ সতু ততটা প্রস্তুত নয়, শরীর সঞ্চার করে নি ক্ষিপ্রতা—যদি বেল্ট দিয়ে প্যাঁদায়? ততক্ষণে পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে নরম ঘাস, জল-পোকা, আর জলোমাঠ গিলে নিচ্ছে, ধরে রাখছে এই দুই বালকের হদিশ। মাঝ বরাবর পৌঁছে গেছে তারা। আর সতুর শংকার জবাবে রণ শিস-ধ্বনিতে বের করছে সামান্য তপ্ত বাতাস, 'ধুস!'

অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবা রঙিন জলে ডানদিকে ভাসিয়ে রাখে চ্যাপটা থালা। তার ওপারে বুনো ঘাস, জল-কাদা, নালা আর সুপুরি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে আড়াআড়ি বাঁশের ফ্রেমে। কচু আর লতানো গাছ সবুজের আচ্ছাদনে, নিবিড়তায়, অন্ধকার পাল-পোষ করে। চোরা-কাঁটা কামড়ে ধরে রুগ্ন গোরুর লেজ, সন্ধের মুখোমুখি সন্তানের নাম ধরে চীৎকার করে ঘোমটার বৌ। সেই চীৎকারের বিস্তার এই এলাকা, রণদের পাড়া। ঠিক হয়েছিল নবজীবন পল্লী নাম হবে, কীজন্যে যেন ভেস্তে যায় সেই প্রস্তাব। হোগলা তলতা, টালি এবং বাঁশের উপকরণে নির্মিত এই অঞ্চল এখন নতুন কলোনি বা রেফুজিপাড়া। হঠাৎ হাঁড়ি পাতিল, বালবাচ্চা সমেত তারা আছড়ে পড়ে এখানে। সতুর কিছুই স্পষ্ট মনে নেই, সব শোনা কথা, চন্নুর দাদু, অন্ন আর কাকামণির মুখে শোনা।

'৪৬ না '৪৭ সাল। স্রোতের শ্যাওলা, মানুষজনের ছেঁড়াফাটা দল। ভাসে, ভাসতে-ভাসতে যায়। ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে ছিটকে পড়ে একটা দল, এখানেই শেকড় চালায়। সব শোনা কথা, সতু দেখে নি, কিচ্ছু দেখে নি। বা, তখন তার চোখজোড়ার সামর্থ্য ছিল না একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তুকে পৃথক করার, স্মরণে রাখার। কেবল সে অদ্যাবধি শোনে :

কী কাণ্ড! নৈনেত্তোর!

যুদ্ধ। বোমা। দেশ স্বাধীন। দেশ ভাগ। দেশত্যাগ। স্বাধীনতা। মন্বন্তর। রায়ট, স্বাধীনতা, যুদ্ধ, দেশভাগ, স্বাধীনতা, আললাহ আকবর, বন্দে·· এ···এ···মাতরম···

আর এত সব কিছু ঘটে গেছে একসঙ্গে হুড়মুড় করে, কয়েক বছরে ঘটে গেছে। তারপর আর কিছু ঘটছে না, ঘটে নি। কিন্তু শুনে-শুনে এমন দাঁড়িয়েছে যেন গত দশ-বিশ বছরের ইতিহাসের সে প্রত্যক্ষদর্শী। সে সব জানে, সব দেখেছে, এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পায়। যদিও আসলে তার মনে আছে ভোর রাতে বিউগলের শব্দে সে তরাস খেয়েছিল। তরাস খেয়ে জেগে ওঠে, সরি তখন রাতভর উপোসী অন্নকে

।যথা ঠেলছে।

মাহ! অ মাহ!

অন্ন ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে। সন্তু তখনও ঘুমের ভান নিয়ে নির্জীব, ান কিছুই জানে না। অন্ন উঠতেই বিউগলের শব্দটা শুনতে পেল। রি বাঁ হাতে মুখের লালা মুছে নিচ্ছিল। সরি একটু ঘুমোলেই বালিশে ালা লাগিয়ে ফেলে, বিছানা চ্যাটচ্যাটে হয়ে থাকে। অন্ন বিউগলের ব্দ শুনেই কপালে জোড়হাত ঠেকায়। 'নমস্কার করলা ক্যান?' সরি জ্ঞেস করেছিল। অন্ন হাসে। তার অসাড়, শিরা-জাগা হাতের দুটি তা তখনও কপালেই ঠেকানো। রেফুজিদের পাড়ায় লেড়িকুত্তা আর াখের আওয়াজ পাওয়া যায় একসঙ্গে। বুকের দম নিংড়ে বের করে ারা যেন আমৃত্যু শাঁখ বাজাচ্ছিল। সরি জানে একমাত্র ভূমিকম্প ল শাঁখ বাজায়। সে অন্নকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়, 'অমা!'

কী হৈল?

শোন নি? ভূমিকম্প!

আলইক্ষা!

ক্যান?

হা আমার পোড়া কপাল···আইজ স্বাধীনতা না, রাত্তিরকালে যে নাই আইসা বইলা গ্যালো, মনে নাই!

কী বুঝল কে জানে, সরি আর কথা বাড়ায় না। তবে সে যে খুব কটা মেনে নিচ্ছে এই কথা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবোধ শিশু ই কপট নিদ্রায় বুঝে নিতে চায় স্বাধীনতা। আর রেফুজিদের শাঁখ াগত বেজে চলে, শাঁখের আওয়াজ ক্রমে উন্মাদের মতো চড়তে কে।

আর তারপর প্রায়ই রাতে সন্তু অন্নর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসস করেছে, 'মা, বাবু ফিরবে না এখন? বাবু কবে ফিরবে? এখন তো ধীনতা·· বাবু কবে ফিরবে?'···

হ ফিরব। নিশ্চয় ফিরব। মা ফিইরা যাইব কই? কই যাইব!'

তখন-ও স্বাধীনতার জের কাটে নি। রায়টের তাণ্ডব কমে নি। হিন্দু

মুসলমান রায়ট। রায়টের আগে মিলিটারি। রায়টের পরে মিলিটারি
আর বুকফাটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ গম্ভীর আকাশ ছাঁদা করেছিল : আমি
আমি রসুল। আর—শুয়োরের বাচ্চা! তখন কৎ করে একটা শব্দ। টিং
নরম শরীরে বিদ্ধ হয় অস্ত্রের ফলা। আর আক্রান্ত মানুষটা চেঁচা
তোলে : আমি···আমি রসুল···। তার একটা ঠ্যাং ক্যাণ্ডোপাটি
ঘসটাতে থাকে। টালিগঞ্জ ঘড়িঘর থেকে ভেসে আসে, 'আল্লা
আকবর!' আর হোগলার বেড়ার পেছন থেকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি
পনের বছর এক লাফে পার করে আছাড়ে পড়েছিল রসুলের বুকে
তখন বন্দেমাতরম।···তখন আল্লাহ আকবর।

সত্ত্ব এ-সবের প্রত্যক্ষদর্শী, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি, কে
তাকে কিছু বলে নি। এখন এই দু-তিন বছর পরে মনে হয় সত্বর
কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল? রসুলের বুকের ভেতর বর্শা বিঁ
ছিল, রক্ত ক্ষরণ। আর এ-সবই সে নিশির ডাক, মানুষের আর্তনা
ডাইন, অমাবস্যায় মিশে যেতে দেখে। কিম্ভূত-অন্ধকার তখন কেব
বাসি রক্তের ডেলা। সে অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে একা যেতে ভয় পায়
এমন কি খর, শাদা, মধ্যাহ্নেও। ঐ গাছের ভয়ঙ্কর গল্প আছে, বে
যেন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছিল। তার আত্মা গাছটায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে ব
থাকে···কে না জানে, কে না দেখেছে!

তুলকালাম কাণ্ডের ভেতর হাঁড়ি-পাতিল, ছেড়া-মাদুর, চট, বালি
কাঁথা বগলে নিয়ে রণদের দলটা এল। ভাসতে-ভাসতে এল। ছন্নছাড়
উৎখাত এক জনসমষ্টি। আর তারপর এল জমিদার আর পুলিশ
হাঁড়ি-পাতিল, কাঁথা-কম্বল টেনে ফেলে দিল, শরীরে কাঁচা ক্ষত নি
রক্তের দাগ কেটে-কেটে কেউ-কেউ পালাল। যারা টিঁকে গেছে, ধীরে
সুস্থে কাজকাম ধান্ধাপানি জুটিয়ে নিয়েছে, এখন যা কিছু সাড়াশ
তাদেরই, রণর বাবা এই টিঁকে যাওয়াদেরই একজন। তার মাথায় লা
পড়েছিল। সে নড়ে নি, ইন্দুবালা হাউ হাউ করে কেঁদেছিল, 'চল যা
গিয়া!' আর মাথায় হাত চেপে রণর বাবা দাঁড়িয়েছিল যেন ঋজু বৃক্ষ
এমন কি বজ্রপাত ঘটে গেছে এত স্থির, 'মরলে এইখানেই মরুম···দে

দাব পুতেরা কী করতে পারে।'

তারপর একদিন রণর ঠাকুমা চশমার সুতলি কানে জড়িয়ে লম্পর দ… উসকে দেয়। পদ্মপুরাণ খুলে বসে :

গুয়া বালি তোগুয়া বালি বিষের নাম
কোন কোন বিষের কোন কোন ধাম
বিষ অ…নাই নাইরে
লখাইর শরীলে বিষ অ…নাই॥

সন্ধে হলেই বেহুলার ভাসান গাইত রণর ঠাকুমা। অন্ন বলত, 'বাপের …ন্ম শুনি নাই যে সন্ধ্যাকালে পদ্মপুরাণ গায়। পদ্মপুরাণ গাইতে লাগে …ইবা কালে। আর সতু অন্নকে তিতিবিরক্ত করে তুলত : মা বেহুলার …ন্য রণর ঠাকুমা কাঁদে কেন? পানের দোকানের রসুলের জন্যে তো …উ কাঁদে না! আচ্ছা বেহুলা কি বেঁচে আছে? বেহুলার কি খুব …তোমার মতো! বলো না?

তখন অন্ন সতুকে কাছে টেনে নিত, ঠিক বোঝা যেত না অন্নকে। তখন বড় দুর্বোধ্য। সে সতুর কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাত, 'হ, …হুলা অখনও বাঁইচ্যা আছে…লখাইর ডংশন পড়লে লখাইর জীয়ন …ন্ত্র পড়তে লাগে—নাইলে পুত্র-শোক হয়…'

অন্ন বর্ণনা করে চলে বেহুলার উপাখ্যান, কখন যেন সেই বর্ণনায় …থিত অন্ন কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি জুড়ে দিতে থাকে। সতুর নির্বোধ …খে ধূসর ছায়া নামতে থাকে, কোথাও সিটি বেজেছিল। অকূল সমুদ্রে সমান মান্দাস, আর দুঃখিনী বেহুলা লখাইর হাড়গোড়ের সঙ্গে …পড়ের খুঁটে গিঁট দিয়ে সতুকে বেঁধে ফেলে। সে তার মাকে জিজ্ঞেস …র, 'আচ্ছা, বেহুলার অ্যাতো কষ্ট ক্যানো!'

তয় শোন—

এবং সেই পূর্ণাঙ্গ কাহিনী এবার শোনার কথা। যখন অন্নর গলার … সুদূর হতে থাকে, সামান্য চিকনও। তার সারা মুখ ছেয়ে ফেলে …স গাম্ভীর্য। সতু হাঁ করে গিলতে থাকে—

লখাই হইল চান্দো বাইন্যার ছাওয়াল।…চান্দো বাইন্যার জেদ : C.
হাতে পূজি গো আমি দ্যাব শূলপাণি সেই হাতে পূজিব আমি চ্যাঙমু
কানি ?…চান্দো বাইন্যার জেদ ভাঙনের লাইগা বেহুলার স্বামী লখাই
ডংশন করাইল মা মনসা…সোনার অঙ্গ নীল হইল…

মার কটা চোখের দুর্ভেদ্য ঘোলা রঙের দিকে সতু একদৃষ্টে চে
থাকে। আর অন্নর সেই জলদ স্বর, 'হ, বেহুলা অখনও বাঁইচ্যা আছে
অখনও। বাঁইচ্যা আছে।' সুলতান আলম স্ট্রিটের ঝুপড়ি বস্তি অ
তলতার দেয়াল তখন ক্রমে ফিকে ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যা
মালগাড়ি শ্লথ চলে যায়, দু-একটা পাখির ভয় অদ্ভুত ডাক দেয়। স
থিতু হতে থাকে, লম্প জ্বলে, হ্যারিকেন দুলিয়ে কেউ সাঁকো পার হ
এরপর।

আমি বড় হয়ে দ্যাখো না কী করি!

কী আবার করবি?

কচুকাটা করব।

কারে?

মনসাকে।

হা সর্বোনাশ!

ক্যানো?

মা মনসা দ্যাবতা, সাক্ষাৎ দ্যাবতা…কইস না, জেব্‌বা খইস্যা যাই

দেবতা না, হাতি!

হত্যা!

থাকুকগে।

কস কী সতু…এ দেখি জহ্লাদ ধরছি প্যাটে…।

দ্যাখো না বড় হই আগে…মনসাকে ন্যাড়া করে…

গ্যাসপোস্টে বেঁধে…

চুপ যা, চুপ যা হারামজাদা!

রণর ঠাকুমার চোখে ছানি পড়েছে, এখন আর পদ্মপুরাণ খু
পড়তে পারে না। এখন এমনিই চোখে জল কাটে। সর্বক্ষণ। চমু

ওয়ায় বসে রণর মার নিন্দে করতে-করতে কাঁদে : অ্যামুন বৌ ঘরে নছিলাম হকাল হন্ধ্যা তুইহান রুটি ছ্যায়না খাইতে···কয় আমি নাকি রুস, ক্যাবল খাই···তুমরা তো আছ, দেহ তো হগলই···কও দেহি।

চন্নুর মা খান তুই রুটির সঙ্গে এক কাপ চা করে বুড়ির দিকে গয়ে দেয় : এইট্টক খান আ্যাহন। একখানা রুটি গোল করে পাকিয়ে ড় চায়ের কাপে ডোবায়, তারপর মাড়ি দিয়ে কামড়াতে-কামড়াতে গ্রাসে গিলতে থাকে বলে তার মুখের অজস্র হিজিবিজি জটিল রেখা কস্মাৎ সচল। বুড়ি এক সময় বারান্দার খুঁটি ধরে উঠতে-উঠতে ল, 'অ চন্নুর মা···বলগাছি যে তুমি হাতে ধইরা দিলা তাই খাইলাম হেই মাগিরে জানি কইও না···' বুড়ি চলে গেলে চন্নুর মা বলে, মকা বৌডারে দোষে···হে কী করবো···পোলায় কত রোজগার করে খাবা! ভিমরতি ধরছে···বৌডার হাল দ্যাখছেন নি অন্নদি!' অন্ন ড়া দেয় : দেখি নাই আবার!

সন্তু কোনোদিন রণদের বাড়ি যায় নি। কাওড়াপট্টিতে সন্তু যখনই য়েছে সর্বদা গলুর সঙ্গেই কাটিয়েছে। তাছাড়া অন্ন পারতপক্ষে সন্তুকে ওড়াপট্টিতে যেতে দেয় না, ওদিকে পা বাড়ালেই সে পেছনে একটা ক শুনতে পায় : সন্তু···উ···কই যাস? এখন রণর সঙ্গে জলামাঠ ভেঙে তে বেশ মজা লাগছিল। ছুটতে-ছুটতে কলের-গান-ওয়ালা মেটে ড়িটা ওরা ছাড়িয়ে যায়। মেটে বাড়ির কলের-গান। চোঙটা সন্তুকে রুণ টানত, এখনও টানে : মেরে দিল নে পুকারে আজা···।

রণর মা চাল ভাজতে বসেছে। রণ বলে, 'চালভাজা।' আসলে নিক খুদকুঁড়ো। আর গম। ফট্ ফট্ শব্দে তুধের গুড়োর মতো আটা বিয়ে আসছে। চিটে উড়ছে। রণর একগণ্ডা ভাইবোন দরমার সেই পচির ভেতর আগুন, কড়াই আর সেই নারীকে ঘিরে ক্রমে ঘন হয়ে াসে। ছোটমেয়েটা খুন্তির বাড়ি খেয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। াবার হাত পাতে। রণরা অনেক ভাইবোন, সন্তুর কেমন ভালো াগে। সন্তুর বোনটা যদি বেঁচে থাকত! রণর ঠাকুমার দাঁত নেই, াজাভুজি খেতে পারে না। গম-ভাজা শিলনোড়ায় পিষে একটু জল

ঢেলে রণর মা এগিয়ে দিল বাটিটা। আর বুড়ি সেই গুঁড়ো চট চটকাতে সন্তুকে জিজ্ঞাসা করে, 'অ মনু, তুই খাবা ?' আর খুঁদ গেলার কৎ কৎ শব্দ হতে থাকে। সেই শব্দে রণর ঠাকুমার মুখ, সে জটিল রেখা নানান আকার নিতে থাকে। রণর ঠাকুমা হাসে রণর মা ন্যাতা বুলিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে-করতে বলে, 'অ তর বন্ধুরে কী খাইতে দিবি !' আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফালা-রোদ মার চাপা-নাকে-বসানো শাদা পাথরে আছড়ে পড়ে, পাথরে ঝিকোয়। রণ আলগা একটা জবাব দেয়, 'এক বাটিতেই দ্যাও।'

রণর মা এনামেলের একটা বাটিতে খানিকটা খুঁদকুড়ো গমভাজা দিল। এমনিতেই বেশ লোভ ছিল সন্তুর। ওদের বা এ-সব হয় না। হয় দুখানা রুটি নয়ত নিরম্বু উপোস। কখনো-স গোলা-রুটি বানিয়ে দেয় অন্ন। রণর সঙ্গে এক বাটিতে দুজনে থাকে। রণর রুগ্ন বোনটা পুকুর থেকে একটা থালা মেজে নিয়ে তার পায়ে কুচোপানা। রণর বাবা খেতে বসেছে। আর রুগ্ন মে গালের দুপাশে উঁচু হাড় জাগিয়ে বাবার খাওয়া দেখতে থাকে। বাবা উবু হয়ে বসেছে। পাঁজরার হাড় ওঠে, নামে। থালায় ট্যাল ডাল ভেসে যেতে থাকলে সন্তু রণকে জিজ্ঞেস করে, 'এই রণ ! ইস্কুলে যাস না ?'

নাহ্।

কেন ?

কী হবে ?

বাহ্ রে !

লেখাপড়া শিখতে টাকা লাগে না ?

রণ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে। আর বলে তার মানে শিগগিরই সে প্যাকিঙ কোম্পানিতে ফোড়নের ক লাগবে। না-না করে ঘরে রোজ দুটো টাকা আসবে তাতে। হঠাৎ সব কথায় রণকে ভারিক্কি লাগে, লম্বাটে মুখে রণর নাক তখন খড় টান-টান হল রণ। পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে

কারখানার রঙিন জলে ছুঁড়ে দিল। টুপ করে একটা শব্দ।

তুই কাজ করতে পারবি!

হুঁ।

যাহ্।

সত্যি! বলে আমার সঙ্গে কত ছেলে কাজ করছে!

বেশ মজা তোর, আমাকে তো কানাইমাস্টারের ইস্কুলে যেতে হবে।

বেশ হয়েছে। বেঞ্চর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকগে এখন।

তুই বই পড়তে পারিস?

নাহ্।

একদম না!

একদম না।

এরপর কিছুক্ষণ ওরা চুপ থাকে এবং চিন্তিত দেখায়। রণর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যেন সে আদৌ দুঃখিত নয়। বরং এই যে উকিলদাদুর বাড়ি থেকে খবরের কাগজ চেয়েচিন্তে এনে ঠোঙা আর মা ঠোঙা বানাচ্ছে তার থেকে প্যাকিং-এর কাজে লেগে যাওয়া ঢের ভালো।

রণ এক মুঠো ভাজা মুখে পুরে দেয়। রণর বাবা আঁচাচ্ছে। সন্তু রণর বাবার হাতের কড়া দেখতে পায়। শক্ত শক্ত ঢিবলি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের অর্ধেকটা কাটা। সন্তু সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে, তার বাবার হাত দুটো অমনি কেন রে!'

দুপাটি দাঁতের ফাঁকে একটিমাত্র গম-দানা কাটে রণ—মেশিনে।

মেশিনে?

কেন, হাত পড়ে গিয়েছিল?

ভ্যাট!

তবে?

মেশিন দেখেছিস কখনো?

নাহ্।

থালে আর কী বলব!

রণর বাবা হাফপ্যান্টের ওপর ঢোলা জামা চাপাতে-চাপাতে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কানাইমাস্টারের ইস্কুলে ভর্তি হইছো, নাহ' কথাটা শেষ করে রণর বাবা তার কালো দাড়ি জাগিয়ে নিঃশব্দে হাসে। থ্যাবড়া নাকে শব্দ হয়। আর সন্তু ভয়ে জড়সড়, কোনোক্রমে ঘাড়টা কাত করে, 'হই নি, হবো।' রণর বাবা বলে, 'ঐ একই কথা, শুনলাম জানি কার মুখে।' সন্তু তখনও ভাবতে পারছে না। এই মানুষটাই কোমরের বেল্ট দিয়ে রণকে মারে, যা রণর মার কপালের কাটা দাগটা বেশি পুরনো নয়। রণরও যেন এ-সব খেয়াল নেই, কেমন হাসিখুশি আর হঠাৎই রণর বাবা গলা চড়িয়ে রণর মার দিকে ফেরে, 'দ্যাখো, দ্যাখো…দেইখ্যা শেখো…বাবায় মইর‍্যা বাঁচছে আর মায় ছাওয়ালরে মানুষ করার জন্য কী না করতাছে…চনুর বাবায় তো কইল কোথায় জানি কাম নিছে…।'

এসময় চালভাজার বাটিটা উল্টে যায়। রণর মা হঠাৎ খুন্তি ফেলে চ্যাঁচায়—দিলা ছাওয়ালডার খাওয়া…পোলাপান মানুষ মায় হেরে কিছুই জানতে দ্যায় নাই…করলা এক সর্বোনাশ…অ সন্তু! সন্তু! কই যাও মনু, শুইন্যা যাও। রণর বাবা এবং রণ দুজনেই ছুটছিল। আর সন্তু যেন পাগলের মতো ছুটছে, এত ক্ষিপ্র যে সে কী করে হল! ক্রমে সে তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়। ভুতুড়ে গাছও পেরোয়।

চনুদের মাঠকোঠায় তখন সমস্তই একান্ত স্বাভাবিক ও শ্লথ। কাকামনি তিনদিন যাবৎ বেপাত্তা, কোথায় যেন শো ছিল। চনুর দাদু কোর্টে গিয়েছে, চনুর মা দাওয়ায় পানের বাটা নিয়ে বসে। অন্ন এক মনে কচুর লতি ছাড়াচ্ছে। আর কী নিয়ে যেন গল্প করছে, 'অগো কথা আর কইয়েন না, কত দ্যাখলাম, হু!' পেয়ারাগাছের কিম্ভুত ছায়া অনড়, উঠোনে পড়ে ঝিমোচ্ছে। চাতালে নরম লাফ দেয় ক্ষিপ্র বেরাল। সন্তু এরকম এক পরিস্থিতিতে এসে পড়ে হঠাৎ এবং একটু-একটু কাঁপে। আদতে হেঁচকি চাপতে গিয়েই তার এই কম্পন। সন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্ন গল্প করে যায়, বেরালটা শিকার কব্জা করতে না

পারায় ফিরে গেছে, আর মেয়েলি গল্প নরম রোদে মেলে যেতে থাকে। বেশ খানিকটা এগোলে বোঝা যায় তারা উকিলঠাকমার নিন্দে করছে। সন্তুর কাছে মুহূর্ত তখন একটা পুরো দিন। গল্প চলছে তো চলছেই, 'হ' 'শুনছি,' 'জানেন-নি'। সে অপেক্ষা করতে পারে না, কাঁদতে পারেনা, কেবল হেঁচকি, একরাশ কচুর লতি ছাড়ানো হয়ে যায় অন্নর। সে আপন মনে বলে, 'কাবে খাড়াইয়া আছোস ক্যান?' সন্তুর কোনো জবাব পাওয়া যায় না. অথচ তার ঐ নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কিছু একটা ছিল। ফলে অন্ন পুনরায় বিড়বিড় করে, 'কবি তো?'

তুমি মিথ্যুক।

কী?

তুমি মিথ্যুক।

কী কস, কস কী তুই অ্যাঁ?

মিথ্যুক, মিথ্যুক, মিথ্যুক।

অন্নর কোলের কাছে বঁটি উল্টে যায়। একরাশ কচুর লতি কোথায় ছিটকে পড়ে, খামকা কয়লা পুড়তে থাকে উনুনে, সন্তুর হিক্কা এবার শব্দ হয়ে যায়, এতক্ষণ গলার কাছে আটকে থাকা দুষ্ট বাতাস ভাপের মতো উড়ছে, অন্ন চাৎকার করে, 'কী কইলি তুই···তোর অ্যাতোখানি সাহস···বাইরা···বাইরাইয়া যা··· মর···মর···মর···।' দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অন্ন চড়াতে থাকে, আর ছেলেটা গোঁজ হয়ে মার খায়, 'হ্যা মিথ্যুক··· মিথ্যুক··· মিথ্যুক।' চন্নুর মা মধ্যস্থতা করে, সন্তুকে আড়াল করে দাঁড়ায়, 'অ অন্নদি, করেন কী, মইরা যাইবো যে!'

যাউক অমন ছাওয়াল থাকার থিকা না থাকা ভালো···এই যে তিনডা চইলা গ্যালো মরছি···মরি নাই। দুধকলা দিয়া আমি কালসাপ পুষতাছি!···মরুক। আমার হাড় জুড়াইব।

চন্নুর মা সন্তুকে সরিয়ে নেয়, 'ছাওয়ালেরও বলিহারি খাড়াইয়া-খাড়াইয়া মার খাইতাছে···ছুইটা পলা।' আর প্রবল বৃষ্টিপাতে, বেমক্কা মারের চোটে সন্তুর শরীর নরম, ঢিলে। সরি ফিরলে সে কেবল বলে, 'তুইও মিথ্যুক···বাবু আর কোনোও দিন ফিরবে না।'

অন্ন কখন আবার উনুনের ধারে বসে গেছে। কড়াইয়ে কচুর লতি সেদ্ধ হচ্ছে। সরিও কথা বাড়ায় না, সে সন্তুর ইজের আর কী-সব কাপড়-চোপড় কাচতে পুকুরঘাটে যায়। মাটকোটায় শান্তি অক্ষুন্ন। সকালের কুয়াশা-ধোঁয়া উড়ে গেছে, এখন ওষুধ কোম্পানির শূন্য ডোবা, ডোবায় শাদা বক। অন্ন বিড়বিড় করে 'প্যাটই হইল আসল শত্তুর···নাইলে আর কী!' এ-সব কথা ভেবে অন্ন খুঁটির মতো নিজেকে শক্ত রাখে। না হলে অ্যাদ্দিনে সন্তু আর সরি কোথায় যে ভেসে যেত!

প্যাট হৈল জলন্তর
তর জন্য হই ত্যাশান্তর ॥

আবার বর্ণনা, যাতে এই ছড়া গড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে মূর্ত এবং শরীর পেয়ে যায়। এমন-কি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও ঘটে দীর্ঘশ্বাস সহযোগে। তখন অন্নর সামনে অনড় এক প্রাচীন খুঁটি বা থাম, যা ধারণ করেছে আংশিক এই মাটকোটার ওজন। ঐ থামে পুরাতন পারিবারিকতা আছে। আছে মলিন আলকাতরা। তথাপি তা বড় ঋজু। চন্নুর দাদুর জমিতে প্রোথিত সেই খুঁটিতে ইতস্তত গর্ত আছে, আছে শাদা এবং ক্ষুদ্র ঘুণ। এমন নয় যে অন্ন ঐ কথা, ছড়া, কেবল খুঁটি সাক্ষী রেখে বলে চলেছে, যেমন সে প্রায়ই বলে। কারণ, ভিন্ন শব্দ ছিল। পিঁড়ি ঠেলে উঠে যায় চন্নুর মার শরীর, সপাটে আছড়ে পড়ে দীর্ঘ ছায়া। সেই ছায়ার ওতপ্রোত ওজন এবং ছায়ার শরীরে অঙ্গসংস্থান বৈশিষ্ট্য হেতু থেকে যায় শাদা এবং শূন্য কিছু অংশ। সেই-সব অংশ নড়ে চড়ে, ভাঙেও। ওদিকে কাপড় আলগা বলে চন্নুর মার সায়ার গেরো দেখা যায় ; আঁচলে হলুদ ছোপ, তাও দেখা যায়।

…দুঃখের ধাক্কায় ফিকিরে শরীর আউল হয়…পাথইরা মনডাও পোড়ায়…ত্যাশ যে ত্যাশ…প্যাটের জ্বালায় মাইনষে সেই চোদ্দ পুরষের ভিটা ছাইড়া · ছুটে, ছুটে…ছুটে …।

তখন কোথাও চীৎকার: পলাইনা, পলাইনারে…। তখন কাদা অন্ধকার ভাঙে মানুষের যূথবদ্ধ পা। কোথাও পুঁটলি, সেই জনসমষ্টির হাতে-হাতে হাত-শিকল, ছুটছে। মাঝ নদীতে অনড় এক জলযান, ষ্টিমার গাঁ গাঁ করে ডেকে তাদের ভয়, তাদের শৈথিল্য, তাদের আড়ষ্টতা ছিন্ন করে। ক্রমে পাড়ের দিকে অসম্ভব শ্লথ এগোয়। যুবতী কন্যার শোকে নদীবক্ষে ঝাঁপ দেয়, কেউ ঝাঁপ দিতে চায়। নদীর ওপারে যে জলছবি বাঁশপাতা ও হিল্লোলিত ধানে নত, যেখানে লতানে গাছ ছড়ায় অন্ধকার, ভেজা ভেজা গন্ধ; বাইর-বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ দানশা চোরার গপ্পো সমেত সেই দেশ থেকে ক্রমে তারা সরে যেতে থাকে… পলায়…

সমগ্র এই বর্ণনার আগু-পেছু ঐ সংক্ষিপ্ত ছড়া থাকে। আর এভাবে তত্ত্বটা তৈরি হতে থাকে বলে বারংবার ছেদ। শ্বাস ক্ষেপণে অপারকতা স্পষ্ট, চিহ্নিত। ঐ ছড়া, তদুপরি টীকায় অন্নর কাছে দেশ এবং দেশ-বিভাগ আবদ্ধ। আবার তা আবদ্ধ বলে শ্বাস, দীর্ঘ, ক্রমে আরো দীর্ঘ। আর জটিল এই ইতিহাস, পরিস্থিতি. জটিল—পরিস্থিতিতে মানুষের কেবলমাত্র বাঁচার জন্যে নির্দিষ্ট, সংগঠিত ও অ-সংগঠিত সমস্ত আচরণের পশ্চাতে যাকে শত্রু বলে সে সনাক্ত করেছে তার বসবাস তারই শরীরে। মানুষের শরীরে। ফলে ঐ পেট, যাকে সে শত্রু বলে জানে তার বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের কোনো দিশা না-থাকায় সংগ্রাম দীর্ঘ-স্থায়ী, দীর্ঘসূত্রী।

চন্নুদের ফাটা বারান্দা তখন এরকম: উনুনে প্রজ্বলিত শাদা ভয়ংকর আগুন ভাত ফোটাচ্ছে; আগুন, বাষ্প এবং খানিকটা নির্ভেজাল বাতাস পরস্পর মিশে গিয়ে উড়ছে …চন্নু তখন মর্নিংইস্কুল থেকে না-ফেরায় কোনো তাড়া নেই. আবার চন্নুর বাবা এবং দাদু না-থাকায়, সরি না-থাকায় সামান্য নির্জনতা আছে। সন্তু খেতে বসেছে, পাঠশালায় যাওয়ার

ব্যগ্রতা আছে, যদিও অম্বর টানা সংলাপ বেচারাকে বিব্রত করছে। চন্নুর মা গেরস্থালীর কাজে থেকে-থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে বলে অম্বর শব্দগুলো দ্রুত অনুসরণ করে চলেছে তাকে। তথাপি যখন মাঝে-মাঝে তাকে এমন-কি চোখেও দেখা যাচ্ছে না তখন অম্বর যেন-বা ঐ খুঁটির কাছে সোপর্দ। আর বলে চলে একই বৃত্তান্ত। এভাবে সময় গড়ালে একসময় চন্নুর মার চ্যাপ্টা-মুখ অর্গল-মুক্ত, সে উগরে দেয় সামান্য বদ্ধ-বাতাস, পোকা দাঁত খুলে পড়ে যেন-বা—

হ, হত্তা!

মুহূর্তে তারা বড় একাত্ম। বয়সের মাত্রা ও ভার দ্রুত তাদের একাত্ম করে পশ্চাতে থেকে যায় দীর্ঘ, প্রলম্ব-স্মৃতি, জট ও জটা। হয়ত বা পশ্চাদভূমির সেই স্মৃতি তাদের জাগায়। টের পাওয়ায় ঐ-সব কথার আমূল নগ্নতা। যা সত্য, যে সত্য তারা দেখেছে, প্রত্যক্ষ করেছে, যাতে তারা নির্যাতিত। কথাবার্তায় ক্রমে সেই দৃঢ়তা এসে যাচ্ছে, সাবলীল। বিস্তৃত করছে নিজস্ব লীলা। ফলে মায়া ও নির্দয়তা। তাদের মধ্যে অনায়াস আলো-আঁধারির জাল বোনা হয়:

সন্তানের মুখের গরাস্ মায় কাইড়া খাইতাছে···স্বচোক্ষে দ্যাখছি ·

এবং উচ্চারণের ঘাত বাক্যটিকে কাটে। খণ্ড খণ্ড করে। যেন-বা ঐ বাক্যের মধ্যস্থিত তাবৎ বস্তুকে সে পৃথক করে, সামান্য দূরত্ব দেয়: সন্তান। মুখের গ্রাস। মা। আর থাকে শীর্ণ রগের তরঙ্গ-আন্দোলিত হাতের ফণায় বেগ-সম্পন্ন একটি মুদ্রা। যাতে সেই হাত শ্যেন-পাখি।

পঞ্চাশ সন···

তখন দেশভাগ নেই, তখন স্বাধীনতা নেই।

ভবানীপুরের ত্রি-তল বাড়ির যৌথ পরিবারের তখন একচ্ছত্র অধিপতি, কর্তা, জেঠু। ঝাঁকা-মুটের মাথায় চড়ে জগুবাবুর বাজার কাতলার ঘাই সমেত উঠে আসে রক্তিম শানে, ঘোমটার বৌ নরম আঙুলে টিপে নেয় মাছের শরীর: যত্ন দেইখো পিত্তি ফাটাইও না···। বৃহস্পতিবার নাপিত-বৌ নখ পরিষ্কার করে আলতা সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যায়। তখন দেশ ছিল। খোওয়াক্ষীর, পান-সুপারি, যশুরে কই ইত্যাদিতে

সমৃদ্ধ। পুজোয় ঢাকাই শাড়ি। এসেন্সের গন্ধ।

নামগুলা মুখস্থ করতে করতে সন্তু সেই দেশ দরমার ঝাঁপে লটকে থাকতে দেখেছে এই সেদিনও :

ফরিদপুর জেলার আমগ্রামের দেওয়ান চক্রবর্তীদিগের

বংশলতিকা

দেওয়ান শ্রীযোগেন্দ্র চক্রবর্তী
(ছয়ঘরিয়া কুলীনের প্রবর্তক)

- পূর্ণেন্দ্র চক্রবর্তী
  - শিবেন্দ্র চক্রবর্তী
    - জগন্ময়ী দেবী
    - ললিতেন্দ্র চক্রবর্তী
- মহেন্দ্র চক্রবর্তী
  - মণীন্দ্র চক্রবর্তী
  - হরেন্দ্র চক্রবর্তী

পারিবারিক বৃক্ষ। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র সদানন্দ চক্রবর্তী ঐ তালিকা (বা লতিকা) বর্জিত। বা, সে যেন ঐ বৃক্ষ থেকে জাত কোনো বৃক্ষ নয়, ফল মাত্র। যা মাটিতে পতিত, পরিত্যক্ত। যখনই সে তাকিয়েছে ঐ বৃক্ষের দিকে তখনই সন্তুর বড় আলগা লেগেছে। কিছুটা এমন যেন সে সম্পর্করহিত।

আর, এখন এই মন্বন্তরের বর্ণনায় অন্ন গেয়ে উঠবে পারিবারিক গৌরবগাথা। দাতব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী সেই-সব বর্ণনায় ওতপ্রোত। চন্নুর মা বলবে : অখন ঐ যে বাইর বারান্দা…দুই বেলা পঞ্চাশখান পাত পড়ত।

অন্ন তার শরীরস্থ পেটের যে সমস্যা থেকে গুহ্যতত্ত্বে চলে গিয়েছিল এখন সেই তত্ত্ব উভয়ের বিচিত্র সব স্মৃতি ও গৌরবে আনন্দস্রোত মাত্র। তারা পান খায়।

এট্টু চুন দ্যান দিদি।

আটটা বাজতে-না-বাজতে অন্ন শাদা থান মাথায় টেনে দেয়। ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে, 'সত্তু সকাল-সকাল খাইয়া লইস, (চন্নুদের ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলে) দেইখেন চন্নুর মা দিদি।' ঘরের ভেতর থেকে পানের রসে ভেজা শান্ত স্বর রেশমের মতো খুলে যায় : আইচ্ছা, কোনোও ভাবনা নাই, আপনে যান। তখন তুলসীগোড়ায় দীর্ঘ ছায়া। তার পর যে ট্রেনটা দূরের শব্দ নিয়ে আসতে থাকে নরম রোদের মধ্যে, সেই ট্রেন ডোবার জল কাঁপালে পুরো আটটা বাজবে। অন্ন ফেরে যখন ছুরির ফলায় বিদ্ধ সোনালী বিকেল হাপিস হয় অ্যাম্পুল ফাক্টরির ঘোলাটে জল পেরিয়ে। লম্পট রাত তখন কালো জামার বুক পকেটে টাকা নিয়ে ক্যাওড়াপাড়ায় জুয়োর তাস ফেলে। অন্ন ফিরে আসে তার শরীরের ব্যাসার্ধ জুড়ে টোকো গন্ধ-ঝাঁজ থাকে। ফিরে এসে অন্ন স্নান করে, তার নাক, মুখ, গলা বেয়ে অজস্র ধারায় জল নেমে যায় নোংরা পায়ের দিকে।

ভেজা কাপড় সেঁটে যেতে থাকে ফর্সা চামড়ায় আর জলস্রো• কুঁচকে দেয় সেই বিস্তীর্ণ থান, শীতল করে। সত্তু এরকম সময় গামছা দেওয়ার আদেশ শুনবে বলে উৎকর্ণ। আর একটু পরেই তাদের মাট-কোটায়, দরমার বেড়ায়, বাতাস নিক্ষেপ করবে নরম গন্ধ। অন্ন পিঁড়ি পেতে দু-দণ্ড উদাস বসে থাকবে, ক্যাওড়াপাড়ায় গড়াতে থাকবে মৃদু আলোর বল। আর সত্তু সটান ফেরত যাবে বিদ্দেসাগরের কাছে। সেকা রুটির গন্ধ ওড়াউড়ি করবে চন্নুদের বাড়িতে।

গত সপ্তাহে সরি জেঠুর কাছে যায়, মাসকাবারি পাঁচ টাকার খয়রাতি সাহায্যের জন্যে। টাকা তো পায়ই নি, উল্টে দাগা দেওয়া সব কথা শুনে আসে। সরি ফিরে আসে নির্বোধ ফোলা মুখে। কোনো কথা না বলে সে এটা-সেটা করতে থাকে, অনর্থক বইয়ের তাক ঝাড়ে। পলকা কাঠের তাকটিতে সত্তু ও সরির পাঠ্য পুস্তক ছাড়া পোকায় কাটা আর একখানা বই আছে, 'কুমারসম্ভব'। বইটি কখনও ছোঁয়া হয় না। অন্ন, সরি দুজনেই গ্রন্থটিকে শ্রদ্ধা করে। সরি এখন সত্তুকে টেনে নিয়ে

যেতে চায় সাবান ঘষবে বলে। তারপর কবার মতো তৃণটুকুও না-পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত : মায় কই !

এখানে এক বৃত্তান্ত ছিল। অন্নর মুখে শোনা সেই বৃত্তান্তে সন্তু এবং সরির পিতা এক ধনবান ব্যক্তি। ব্যবসায়ী। জেঠুর সঙ্গে বাবুর নাকি ব্যবসা ছিল, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের। বাবুর নিজস্ব লরি ছিল। সেই লরির মালিকানা বাবুর অনুপস্থিতিতে অন্ন অবলা-মেয়েমানুষ জেঠুকে লিখে দেয়। ফলে লরি বাবদ অন্নর মাস-খোরাকি পাওয়ার কথা। ব্যবসার সেই অমৃত ফল এখন মাসকাবারি খয়রাতি সাহায্যে পরিণত। আর অবোধ অপোগণ্ড শিশুরা পর্যন্ত অন্নর শরীরের তাপে টের পায় : মান, সম্মান, ইজ্জত। ফিরে এসে সরি মুখ খোলে নি, সরি কোন কথা বলতে চায় না, সে বর্ণনা করে চলে জেঠুর বাড়ির প্রাতরাশ : অরা না রোজ ফল খায়···মেজদি যা একখান জামা কিনছে বুঝলা···। আর অন্ন অস্থির হতে থাকে, ঘামে : আদেইখলা ! ম্যাজদি জামা কিনছে হেইয়ায় তর আনন্দ কিসে, বলদ কি আর গাছে ধরে। অন্ন ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে : আসল কামের কী হৈল, তুই জানি হ্যাগো সুখ দ্যাখতে গেছিলি ! সরি তখন নির্বাক। সরি ততো নির্বাক হতে থাকে। ক্রমে তার মুখে থেমে যায় পেশী সঞ্চালন। কপালের নীচে সরির কানের লতি-ছোঁয়া সূক্ষ্ম নীল বিদ্যুৎরেখা, মন্থর প্রাণ, ক্রমে তা-ও নিশ্চল। কেবলই একটা রেখা, বক্র, মামুলি। আর অন্ন চ্যাঁচায় : কথা কানে যায় না দেহি ! হারাইহস নাকি গিলা আইছস, কথা ক কইলাম···হারামজাদার শরীলে জেদ দ্যাহ···।

এ সময় সন্তু একেবারে ফালতু হয়ে যায়। অন্ন আর সরির মধ্যে দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে সরাসরি এক নির্দয় সম্পর্ক। সন্তু সেখানে কেউ না, কিছু না। আর ক্রমে অন্নর শরীরে সেই-সব লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে, শাদা দাঁত ঝলসাচ্ছে ! চাবির রিং সমেত আঁচল ঘসটাতে থাকে ফাটা মেঝেয়। চোয়ালের হাড় দেখা যায়। সরির চোখের শাদা জমিটুকু গ্রাস করতে থাকে তারই কালো তারা। অন্ন আক্রমণকারী, দাঁতে পিষে ফেলছে 'মাগি' এই শব্দ। সরির বসার ভঙ্গি আচমকা ভেঙে যায়, শরীরটা টানতে

থাকে, ঘষটাতে থাকে। এবং পেছনে মাটির দেওয়াল, সরি গুটিয়ে নেয় হাত পা, কী একটা শব্দ করে। আর তার শরীর কেমন চারপেয়ে জন্তুর আদল পেয়ে যাচ্ছে। এক সময় সে হাত দুটো করজোড়ের ভঙ্গিতে তুলে ধরে বলে কেমন শৃঙ্খলিত। আর অন্ন আছাড় খায় তার নিজ শরীরের সেই দুর্বল মাংসপিণ্ডে। তাদের শরীর তীব্র টানে, আর দু-একটা কুচ্ছিত গালাগাল, শ্বাসধ্বনি ইত্যাদিতে পরস্পর মিশে যেতে থাকে। অন্নর কনুইয়ে সরির সর্দি লেগে যায়। আর ঠিক কখন যে দুটি শরীরের মধ্যে নিরুপায় সতু নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল অনিবার্য ভেবে, সে নিজেও জানে না : মারবা না।

সতু !

নাহ্।

সইরা যা কইলাম।

নাহ্।

খুন কইরা ফেলামু।

করো, খুন করো, করো···

অন্নর আঁচল ফেঁসে যায়, সতুর শরীরে সে বল প্রত্যক্ষ করে। সেই বল, শক্তির মুখোমুখি অন্নর নিজেকে কিছুটা বা অপারক ঠেকে। সরি আতংকিত, সতুর ক্রোধে সরি যে স্পষ্ট ভাসছিল। ও ঘেন্না টের পায় হাতে সে আতংকিত। আর অন্ন হাতের বেলুন দিয়ে সতুর মাথাটা এক লহমায় ফাটাতে পারে না বলে বাধ্য হয় সরিকে ছেড়ে দিতে। খণ্ডযুদ্ধের এই পরাজয় তাকে হঠাৎ আরও বিষণ্ণ করে, সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে সতু তার আচরণের অসংগতি টের পায়, গায়ের জোরে সে অন্নকে ঠেলেছিল। সেই ঠেলা যেন-বা আকস্মিক নয়, যেন সে অনেক দিন ধরে ভালোবাসা ও ঘেন্নায় অন্নকে ঠেলে দিতে চাইছিল—কোথায় যেন জমা ছিল আক্রোশ, কোথায় যেন অন্নর জন্যে তার মায়া নেই, অথচ সে তো মাকে ভালোবাসে ?

সরিও বেজায় ঘাবড়ে গেছে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঠায় বসে থাকে সে। হিক্কা ওঠে। হিক্কার মাঝে নিয়মিত ছেদ থাকে। অবশেষে এই

হিক্কার ছেদ পূর্ণ করে উঠে আসে নিদারুণ শুষ্ক শ্বাস : কেউ কিছু কয় না···বইসা আছি তো বইসাই আছি···হ্যাশে জেঠিমা জিগায় কিছু কবি সরি···মায় পাঠাইছিল···শুইনা জেঠুর মুখখান···এইখানে কী গচ্ছিত রাখছে ?

সবটা শোনার ধৈর্য ছিল না অন্নর, বারান্দায় ঠেস দিয়ে বিলাপে সমর্পণ করে। তার শোক গভীর গর্তের মতো খুঁড়ে চলে চল্লিশটি বছর, মৃত স্বামী, টাকার অভাব, বিনা চিকিৎসায় মারা-যাওয়া কোলের মেয়েটা, খামকা সে মেয়েটাকে মারল···। এই-সব কেমন অন্যায়, পাপ এবং তাকে কেন্দ্র করেই সব আবর্তিত, ফলে অন্নর ক্রোধ, গ্লানি নিরাকার অত্যাচারে তাকেই ফালা ফালা করে · মায়রে মারলি! তুই মায়রে মারলি!

. সতু তীব্র মৃত্যু প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করছে বলে সে নির্ঘাৎ মারা যাবে এরকম বিশ্বাস তাকে জাপ্টে ধরছে।

কাজটা পাওয়ার পর থেকে অন্নর চোয়ালের হাড় আরো জেগে উঠেছে। প্রথম একটা দিন গুম হয়ে যায়। যুদ্ধের বাজারে টকি দেখতে গিয়ে গোরা সেপাইর তাড়া খেয়ে কেমন ভয় পেয়েছিল—সেই গল্প চনুর মার কাছে কতবার করেছে। 'সরির বাপে থাকতে য্যামুন একলা বাইরাই নাই, ত্যামুন ভগবান এখন কয়—খাড়া, তরে দ্যাখাই···।' এই অবধি বলেই মাঝপথে অন্ন থেমে যায়। আর নিঃশ্বাস গোনা যায় তখন। চনুর মা কোনো কথা বলে না। অবুঝ সন্তানের জন্যে, বাঁচার জন্যে সেই মানুষ এখন প্লাস্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। পুরো একটা দিন অন্ন মুখ বুজে ছিল। সতুকেও একটা কথা বলে নি, একবারও বলে নি—কী রে ছ্যামড়া, পড়তে বইলি ?

এখন ন-টা বাজলেই সতু টের পায় চনুর দাদু তেল মাখছে। তার লোমশ কানে প্যাঁচানো থাকে পৈতে। নাকে তেল টানে বলে সঁং সঁং শব্দ, তার পর নাভিতে আঙুল ঠেকায়। দূরের কারখানা থেকে ভেসে আসে সাইরেনের শব্দ। সাইরেন মানে যুদ্ধ, যুদ্ধের সময় সাইরেন বেজেছিল। যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজত। সতু যুদ্ধের গল্প শুনেছে,

বোমারু বিমান। সাইরেন। খিদিরপুর ডকের বস্তিতে বোমা মেরেছিল। খিদিরপুর কোথায় সে জানে না। সে শুধু শুনেছে যুদ্ধের সময় খিদিরপুর বস্তিতে বোমা পড়েছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে সে আর কিছু জানে না। কেবল অন্নর মুখে শুনেছে যুদ্ধের পরে তার জন্ম। ঠিক যেমন অন্ন তার খুড়িমার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কথা বলে ফেলে। বা আর কারো জন্ম কিংবা বিয়ের কথা বলতে গিয়ে বলে : হেই মন্বন্তরের কালে…। কাঠগোলা বস্তি আর ক্যাওড়াপাড়ার দু-চারটে ঘর থেকে হিড়হিড় করে লোকজন টেনে বের করে সাইরেনের শব্দ। রনর মা বলে : শ্যামের বাঁশি। আর ক্ষেমি পিসি ভোঁ শুনলেই খিস্তি করে। কেন যে করে সতু জানে না। সতু কেবল জানে কারখানার ভোঁ। দূরের কারখানা। আর সাইরেন। সাইরেন মানে যুদ্ধ। সে যুদ্ধের পরে জন্মায়।

লম্বা চালার নীচে সতু ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসেছিল। আগে নাকি এই চালার নীচে দু-বেলা বিশখানা পাত পড়ত। কাঙালী-ভোজন হত। সেই যুদ্ধ, আকাল আর মাগগির দিনে। ক্যাওড়াপট্টির কেউ-কেউ আজও সে কারণে সম্ভ্রমে চন্নুর দাদুকে পথ ছেড়ে দেয়, দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে, সামান্য হুকুম নিষ্ঠায় পালন করে। কারণ, হয়ত সেই ছোকরার বাপ যুদ্ধের বাজারে এই চালার নীচে পেটের আগুন নিভিয়েছে। এতসব সতুর জানার কথা নয়। কিন্তু সবই সে জেনে যায় আশ্চর্য কৌশলে। আসলে বয়স্করা বিভিন্ন অবস্থায় গপ্পো, ঝগড়া বা পুরনো দুঃখের জাবরে জিভের আগায় ইতিহাস সচল রাখে। আর উৎকর্ণ সতু সব শোনে, শুনতে পায়, ফলে সে জেনেও যায় অনেক গর্হিত কথা। যেমন, চন্নুর দাদু তখন হোমরা-চোমরার চাকরি করতেন। আর যথেষ্ট উপরি অর্থাৎ ঘুষ ছিল নিত্যকার আমদানি। বিলিতি মদ খেতেন। বাড়িতে প্রতি রোববার মাংস হত, রাতে লুচির সঙ্গে মিষ্টি। কাকামণি ম্যাট্রিক পাশ করেই লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ম্যাজিকের বাক্স ছিল। সেই বাক্স কাকামণির আত্মা, দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াত ঐ বাক্স সমেত। পান্তাভাত খেতে ভালোবাসত আর গলা ফাটিয়ে হাসত। চন্নু

হওয়ার পর একবার দেড় মাসের জন্যে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চন্নুর
ঠাকমার গায়ের রঙ কালো ছিল, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে হঠাৎ মার
যায় ; কী-করে কেউ জানে না। দাদুর সঙ্গে চন্নুর মার লাগলেই নানান সং
তথ্য বেরিয়ে আসে। আর ছুতোনাতায় প্রায়ই দু-কাঠি বেজে উঠত
চন্নুর মার নাকের পাটা তখন ঈষৎ ফুলে উঠত, আর দাদু পিছু হঠতেন
বুইড়া হাড়মাস খাইল…লজ্জা নাই বুইড়া…। তার পর তুই-তোকারি শুর
করত ; যদিও চন্নুর মা শ্বশুরকে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলত, শরীরে
নীল ক্রোধ জটিল, ছড়িয়ে পড়লে, চন্নুর মার লাগাম থাকে না। আর
কী এক অজ্ঞাত কারণে পিতাপুত্র দুজনেই চন্নুর মাকে উত্তেজিত দেখলে
তটস্থ থাকত। চন্নুর দাদুর মুখে তখন ভীত এবং নিরুপায় হাসির মালিন্য
বৌমায় আমার একেরে পাগলি !

খোন ফ্যালাইয়া আপনের আদিখ্যেতা !

আহা !

চুপ কইরা থাকেন, ভাং দিছি খাইয়া বিদায় হন !

এখন চন্নুর দাদুর রোজগার বলতে একমাত্র ভূসম্পত্তি, মালদা ন
কোথায় কিছুটা দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। বৎসরান্তে নারকেল আসে, আ
কাঠ বিক্রির টাকা। নচেৎ আলিপুর কোর্টে মুহুরির কাজটা নেহাৎ শরী
সচল রাখার জন্যে। ফলে সংসার চলছে পুরনো কাসুন্দির ঝাঁজে। এখ
আর বারান্দায় পাও পড়ে না। এখন বেয়াড়া ছাগল সেই ঐতিহাসিক
বারান্দায় কেবল নাদতে থাকে।

সেই বারান্দার দিকে চন্নুর দাদুর বেঁটে আঙুল কী যেন দেখায়
কত লোক যে খাইছে এইহানে বইসা…বুঝলা মন্নু !

মন্নু অর্থাৎ সন্নু তখন কী বোঝে কে জানে। সে দাদুর মরা চো
দেখে, গালের চামড়া দেখে। ঢাকা শরীরে আবিষ্কার করে রহস্য। অথ
ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কেন যে মানুষটা গীতা পাঠান্তে এখানে
এই বারান্দার সামনে, দাঁড়িয়ে থাকে চায় ! অথবা তার ঘোলা চো
কোন স্মৃতির নীচে চাপা পড়ে, চন্নুর মা অত কড়া কড়া কথা বলে কেন
কাকামণি কেন কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না, কেবল ম্যাজিক দেখায়

আঙুল কাটার খেলা, মেমসাহেব হাপিশ। আর চন্নুর মা নিত্যদিন বিকেল চারটে অবধি ঘুমোয়। রুক্ষ মেজাজ তার শরীরের পাহারাদারি করে। রসুল দাঙ্গায় মারা গেলে গুজব রটে কানাইদাই সেই বীর। চন্নুর দাদু কানাইদাকে ডেকে দেশের হালচাল নিয়ে গল্পগাছা করেছিল। মিষ্টি খাওয়াতে চেয়েছিল, চন্নুর মার নীরব ধিক্কার মাটকোটার বাড়ির থামে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। তোলা উনুন পাতলা ধোঁয়া আর কাঁচা আগুনের ক্ষয় অব্যাহত রাখে। কানাইদা হাসছিল, কথা বলছিল, আর সুলতান আলম স্ট্রিটে গেরস্থের বৌয়ের চোখে সেই ছবি অদ্ভুত বদলে যায়। সে দেখে কানাই বমি করছে; হাসতে-হাসতে, দুটো চিন্তার কথা বলতে-বলতে কানাই আসলে গল-গল করে বমি করে চলেছে। সতু জানে না কেন, কেন দাদু অত আপ্যায়ন করে কানাইকে, কানাইদাকে। কারণ এই চন্নুর দাদু, আবার কানাইদার অসাক্ষাতে যে কথা বলত তাতে সেই পিত্ত, বদগন্ধ, আর বমির ঘেন্না।

আইজকাল আর লতাগাছও মেলে না। শাক লতাপাতা কিচ্ছু না। আগুন লাগছে। আগুন। আগে-আগে যা হউক চাট্টি দিয়া গর্ত বুজাইত। আর অ্যাহন!

অন্ন এভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শরীরধারণের আবশ্যকীয় রসদ, খিদে ইত্যাদি তার কাছে অদ্ভুত সব উপমায় ধরা দেয়। পেট হয়ে যায় গর্ত, শরীর রেল ইঞ্জিন। আর খাদ্য এমন কোনো বস্তু যা জ্বালানির মতো ব্যবহৃত হয়, যেমন কয়লা! আর এ-সব নিশ্চয়ই চলার জন্যে, ইঞ্জিন কোথাও একটা যাবে, কিছু একটা করবে। অন্নর এই বচনে যে অনির্দিষ্ট ক্রিয়ার উল্লেখ থাকে সতু বারবার তার অনুসরণে ব্যর্থ এবং কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

সইর্শা বাটা দিয়া ইলশা মাছের পাতরি…একেক জাগায় একেকরকম, আমাগো দ্যাশে ইলশার পেটিতে মসল্লা মাইখ্যা কচি কলাপাতায় মুইড়া ভাতের মধ্যে দিতাম…ভাপে সিদ্ধ…অ্যাহন…

এখন লাইনধারের জঙ্গল, ডোবার পাশে জলা হাতড়ে সরি হন্যে হয়, তার হাত এবং পায়ের পাতা স্যাতা হয়ে আসে, খুচরো ফালতু উড়ো চুল

তার নাকের পাশ আর একটা চোখ আড়াল দেয়। সে খুঁজতে থা
খারকোল পাতার গাছ, কচু শাক। বিনবিন ঘাম বোনা থাকে সরির নাকে
সামান্য ছায়া হেলে পড়ে চুলের অলস নৈরাশ্যে। অথচ সরির উদ্য
ছুটে। হাত আর পায়ে অসম্ভব বেগবান। আর সর্বদা সামান্য আবিষ্কা
এই খোঁজার চেষ্টায়, আত্মগোপনকারী আনন্দ তাকে ঠেলতেই থাকে
সরি ফিরে আসে খানিক শাক লতাপাতা আর নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে
কল্‌কল্‌ শব্দে, ধারায়, মুখের নানান ভঙ্গিমায় কথা বলে চলে: জা
মা…বুঝলা…আমি তো আগে দেখিই নাই…হ্যাশে করলাম কী…
লতিগুলা ছাখছো…! সে যেন যাবতীয় শ্রম করে এই কথাগুলো
জন্যে। অন্নকে কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখে, সামান্য হৈ চৈ…

সরির চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, সে কোত্থেকে ছুটো কৎবে
জোগাড় করে এনেছে। শিলনোড়ায় লঙ্কা পিষতে থাকে: খাইয়া কই
সত্ন! অন্ন কাজে লাগার পর থেকে ছুপুরের রান্না সরিই করে। আ
রান্না মানে তো চাট্টি ফোটানো, কিছু একটা সেদ্ধ কিংবা বাটাবুটি
কোনো-কোনোদিন ফিরতি পথে ওড়িয়ার দোকান থেকে অন্ন ছু-চা
পয়সার ধোকা কিনে আনে।

একা খাইস না রাক্কুসি!

ঠোঙাটা তখন সরি হাত পেতে নিচ্ছিল, তার চোখ জ্বলছিল
আঙুলে করে সে হয়ত সামান্য একটু খুঁটে নিয়ে টাগরায় জিভ ঠেকাত
আর সেই সরল রেখাগুলো খেলাচ্ছলে ভেঙে যেত মুখে, সে হাসত
বেশ ঝাল দিছে…খাইস না সত্ন।

সরি বডডো ধোকা ভালোবাসে, ঝাল ভালোবাসে। আজ আ
ছুঁয়েও দেখবে না। ঠোঙাটা অমনিই নামিয়ে রাখে। তার দাঁত টে
নেয় ওপরের ঠোঁট। অন্ন কাজ থেকে ফিরে ঘরের ভেতর নড়াচড়
করে।

চাইয়া আছোস কী!

কই!

ওর জেববা জানি ট্যার পাই না?

একটু পরেই সরির শরীরটা আউল হয়। তলপেটে বেদনা জাগে, জেগে উঠতে থাকে। অন্ন টের পায়, কিছুই বলে না। সম্প্রতি সরির এই এক ব্যামো শুরু হয়েছে। আর যখনই অসুখটা দেখা দেয়, লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে, অন্ন অযথা সরির ওপর ক্ষেপে ওঠে। তখন অন্নর চোখ সরির দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তা বিষাক্ত তীর মাত্র। অথচ অন্ন সবই করে। যেমন ঈষৎ উষ্ণ গরম জল ভরে দেয় কাচের বোতলে। খাটের ওপর উপুড় হয়ে, কাত হয়ে, সরি ছটফট করে। শরীরে তাপ এসে যায়। আর সতু কাঠ হয়ে থাকে। তার কুট্টি বোনের কথা মনে পড়ে যায়। দিদিও যদি হঠাৎ চলে যায়! এই চলে যাওয়ার সমন পেয়েছে সরি, তার তলপেট আঁচড়ে খামচে সেই সমন ক্রমে মূর্ত হতে থাকে। সত্যিই যদি সরি চলে যায়। তখন? তখন সতু কী করবে?

বেদনা বেশিক্ষণ থাকে না, বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক। তার পর সরি অকাতরে ঘুমোয়। সারারাতে কিছুই খায় না, কেবল ঘুমোয়, যখন ঘুম থেকে ওঠে বড়ই দুর্বল। কেমন ফ্যাকাসে দেখায়। পা টিপে-টিপে অতি সাবধানে হাঁটে, চাতালে যায়। আর সতুর দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে, তখন সতু দিদিকে ধন্যি দেয় কী কষ্টই না সইতে পারে! আর অন্ন চন্নুর মার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে: কী যে করি···। জবাবে চন্নুর মা লম্বা হাই তোলে, তুলতেই থাকে, যেন ঐ হাই আর কোনও দিন শেষ হবে না। চন্নুর মার দুর্লভ মতটি শোনার জন্যে সতুব একাগ্রতা ধ্বংস করে দিচ্ছে ঐ অলস, মন্থর হাই। অখণ্ড সময় ঢুকে যাচ্ছে চন্নুর মার মুখে, অন্ধকার গর্তে। আর হাইটা কেবল উঠতেই থাকে।

সরির মতো বয়সে আমাগো তো বিয়া হইয়া গ্যাছে···

অন্ন ধুয়া তোলে: আম্মার দিদির বিয়া হইছিল নয় বছরের কালে ···অ্যাহন হইছে কী···একদিন বাইর দুয়ারে বইসা দিদি তো খ্যালতে নিছে এমনকালে জামাই আইয়া উপস্থিত। সাড়া পইড়া গ্যালো একেরে, হগলডি একলগে চিক্‌কইর দিয়া উঠছে—অ ননী ছ্যাখোস নি কেডা আইছে, জামাই আইছে। যেই না হেই কথা হোনা দিদি তো পাছার কাপড় তুইলা ঘুমটা দিয়া···

হত্যা !

হত্যা।

কন কী !

তয় আর কই কী। লজ্জা লজ্জা···

আর তারা অনর্গল হাসতে থাকে।

সুলতান আলম স্ট্রিটের দুপুর বড় নির্জন। বড় অলস। মন্থর। কেবল থেকে-থেকে ঢালাই কারখানার হাতুড়ি সেই উলঙ্গ দুপুর থেঁতো করে চলে। গুম্ গুম্ শব্দ হয়। এরকম শব্দ আর গল্প-গাছায় সখীর মতো দুই বয়স্কা নারী অলস অথচ অন্য এক ক্লান্ত ছুটির দিনে পা মেলে দেয়। চন্নর মা পান সাজতে থাকে, একটা ঠ্যাং আড় হয়ে আছে। অন্ন আঙুলের ডগার চুনটুকু দাঁতে ঠেকায়।

ওষুধপথ্যি ছাড়াই সরি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সন্তুকে ডাকে, অথচ গলায় যেন আওয়াজ নেই। সন্তু দেখে দিদির সরু কপালটুকু জুড়ে বাষ্প, ঘাম। সরি হাসে—অ্যাই ভাই !

উঁ।

এক কাজ করবি ?

কী ?

চাট্টি কাঁকড়া আনতে পারবি ?

হুঁ।

দেখিস, মায় জ্যান টের না পায়।

আচ্ছা।

সন্তু বেশ ভারিক্কি চালে হেঁটে যায়। এবং এই সামান্য কাজটির দায়িত্বে সে কেমন যেন মর্যাদা বোধ করে। আর তা ছাড়া এ আর এমন কী কথা ! না পারার কী আছে ! ভারি তো চাট্টি কাঁকড়া ! এর থেকে ঢের শক্ত কাজ সে করে দিতে পারে। গলু তো উড়ন্ত বক টেনে নামায় এক টিপে আর সন্তু চাট্টে কাঁকড়া ধরতে পারবে না !

সুলতান আলম স্ট্রিট, ক্যাওড়াপট্টি আর শান্তিপল্লীর ভেতর ছড়ানো ডোবা আর পুকুর। লাইনধারের জমির ঢাল বেয়ে জলস্রোত। এই

তল্লাটের পশ্চাদ্‌ভূমি বলে আর কিছু নেই, শুধু জল, কচুরিপানা, বাঁশের সাঁকো। আর সেই জলরাশির ভেতর উত্তরপ্রদেশের গোয়ালা মোষের পিঠে খড় ঘষতে থাকে।

সন্তু কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারে না বলে কিছুটা বিভ্রান্ত। তখন সে রেললাইনের দিকে এগোয়। বিছুটি আর আশশ্যাওড়ার ঝোপ ভেঙে গুটি-গুটি হাঁটে। তার কোমর পর্যন্ত বুনো টমেটো বা কখনো হলুদ বিছুটি ফুল। গঙ্গাফড়িং সমস্ত ইন্দ্রিয় ধরে টান মারে। সন্তু কাঁকড়ার কথা ভুলে যায়। টিপে টিপে সতর্ক পায়ে সে এগোয় যেন এক পটু শিকারী। আর গঙ্গাফড়িং বিষয়ে সরির মতামত মনে পড়ে যায়: গঙ্গাফড়িং মেলা চালাক, ধরতে-না-ধরতে ফুড়ুৎ···। সন্তুর হাতের পাঁচটা আঙুল খুলে গেছে, চোখ নিবদ্ধ বিছুটিপাতার কেবল সেই অংশে যেখানে নির্বিকার ফড়িং। যেন এমনিই ধরা দেবে বলে বসে আছে। সে হাতের থাবার সাপটায় টেনে নিতে চেষ্টা করে ক্ষুদ্র ফড়িং। কোথাও নিশ্চয়ই ফাঁক ছিল বা তার হাত আসল লক্ষ্য স্পর্শও করে নি। ফলে পুনর্বার সরির মতামত তাকে ধাওয়া করে: গঙ্গাফড়িং মেলা চালাক, ধরতে-না-ধরতে ফুড়ুৎ···

আর দু-পা এগোতেই ফ্যাকফেকে শাদা মাঠ। দিনকতক আগেও নানান গাছগাছলা লতাপাতায় মাঠটা গাঢ় সবুজের গভীরতায় ভরে ছিল। এখন নির্মূল ঘাস, কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। উকিল ঠাকমা বলে: বেফুজিদের দল এয়েচে থেকে আর কিচ্ছুটি নেই। কচু ঘেঁচু কিচ্ছু রাখে নি কো···সব খেয়ে ফেলেচে···এখন কী খাবি? শেষমেশ ছড়া কাটে—বলে গু খায় না-কো গন্দে আর নোয়া খায় না-কো শক্তে···। উকিল ঠাকমাকে অন্ন দু-চোখে দেখতে পারে না। বলে: অ্যাই পোড়ার ছ্যাশে আছেডা কী!

মার মুখে সন্তু পদ্মার গল্প শুনেছে। গোয়ালন্দ, স্টিমার, আর পদ্মা উথালপাথাল। শুনতে-শুনতে সন্তুর আজকাল মনে হয় সে যেন কতবার গেছে, কত চেনে। যেন এক বুড়ি তার থুতনি ধরে বলছে: আমাগো কালার ছাওয়াল···এতকাল ছিলা কই চাহ্‌ন···। পদ্মা। উথাল

পাথাল, ইলশা মাছ চান্দের মতো ফসকাইয়া যায়...

সন্তুরা মাছ খায় না। দরমার ফাঁক দিয়ে চাটগাঁইয়া বিশুদের শুটকি মাছের গন্ধ নাকে লাগলে সন্তুর গা গোলায়। আর সরির এক টুকরো মাছ পেলেই খাওয়া হয়ে যায়। তবু অন্ন মাছ আনে না। আনতে পারে না। চনুর মা বলে : আপনের সরির মাছের গন্ধ হইলেই হইল। মাছের এই গন্ধ-টুকু কোনো-কোনোদিন চনুর মার বাটিতে থাকে : সরিরে দিয়েন অন্নদি !

চনুর মা যেন কী! মাঝে মাঝে তার মুখ হঠাৎ ভারি হয়ে যায়। অন্নর সঙ্গে কথা বলে না, ডাকলেও কোনো জবাব পাওয়া যায় না তখন। সন্তুদের দুয়োরে অবধি পা ফেলে না। সন্তু দেখেছে অন্ন তখন কেমন কাঁটা হয়ে থাকে। কখন-ও সখন-ও আট আনা এক টাকা কর্জ নেয় অন্ন। তা ছাড়া এক কৌটো চাল, একবাটি আটা এ-সব তো আছেই। বিশেষত এই-সব খুচরো ধারের হিসেব না রাখার এক মহিমা আছে। ফলে প্রতিবার ঋণ পরিশোধের সময় অন্নর চনুর মার সঙ্গে এরকম কথাবার্তা হত :

চনুর মা দিদি আপনে দুই কৌটা চাল পান !

দ্যাহেন, আমার মনেই নাই...

আমার মনে আছে...অ্যাহন এক কৌটা দিলাম...

থাউক-না পরে দিয়েন...

নাহ্ এইয়ার মধ্যেই দিতে হইব।

এমন একটা ভরসার মানুষ বিরূপ হলে যা হয়। অন্নর মধ্যে সন্তু তখন সেই ভয় দেখে। যেন আসলে ঋণের সমস্ত হিসেব, পাইপয়সা পর্যন্ত চনুর মার মুখস্থ আছে। আর এখন এই মুহূর্তে সে যদি সমস্ত ফেরত চায়! অন্নর ভয় হয়, সে খামকা পালার উঠোন পরিষ্কার নিজের হাতে টেনে নেয়। চনুকে ডেকে হাত মুখ ধুইয়ে দেয়। আর এ-সব চলতে থাকলে হঠাৎ একসময় চনুর মার ভাব বদল হয় : জাগা আছেন নি অন্নদি, অ অন্নদি! আর তারপর কিছুদিন চনুর মা অন্নদি বলতে অজ্ঞান। অন্নর মুখে, কানের লাল তিল ছুঁয়ে প্রথম দিকে'বেদনা থেকে

যায় ফ্যাকাসে। আর চন্নুর মা যেন ফুটতে থাকে : শুনছেন নি, অ অন্নদি ···গ্যাহেন ছাওয়ালের কাণ্ড···পান খাবেন নি অন্নদি··। চন্নুর মার এইসব আচরণে প্রচ্ছন্ন গর্ব সতু টের পায়। কিসের একটা গর্ব! সতুর রাগ হয়, কেন যে মা আবার কথা বলে! কিসের মোহে? চন্নুর মা এবং অন্নর সম্পর্কের এই বিশেষ পর্যায় এভাবে শেষ হয়: বেশ আছেন অন্নদি ···সতুটা মানুষ হইলেই হইল···আপনের আবার দুঃখ কিসের. টাকা পয়সাই কি সুখ! এবং এই দুই নারী পুনরায় সখী হতে পারে, সখী হয়ে যায়।

ক্রমে অন্ন বিশ্বাস করতে শুরু করে টাকা পয়সাই সব নয়, সমগ্র নয়, যেন-বা সে তখন সমগ্র যা, তা বুঝে ফেলে বলে সামান্য প্রীত। চন্নর মা কী সেজন্যেই তার পান-পাতা-সদৃশ মুখে আনে আষাঢ়? চন্নুর মার অন্নর প্রতি নির্দয়তার কী কোনো গুপ্ত ঈর্ষা আছে? সরির সঙ্গে অন্নর চাপা আলাপে প্রচ্ছন্ন থাকে সেই ইঙ্গিত: অ-ঋণে অ-প্রবাসে সায়াহ্নে যে শাকান্ন খায় সেই প্রকৃত সুখী। এই তত্ত্ব জানায় অন্ন এবং বলে, 'গীতায় ভগবান বলছেন···।' তার পর তারা চলে যায় চন্নুদের সাংসারিক কথায় যেমন চন্নুর দাদু 'বদ', চন্নুর বাবা 'বলদ' আর···। অন্ন আর সরির মধ্যে তখন বয়সের প্রাচার ধূলিসাৎ, সরি স্বচ্ছন্দ মন্তব্য করে: আহা!··· গ্যাখছো নি!

যদিও আষাঢ় অতিবাহিত হওয়ার পর, পরেও অন্ন বড় সম্পর্ক থাকে। কোথাও যেন-বা বিদ্ধ থাকে কাঁটা। চন্নুর মাকে তার অতিরিক্ত তোয়াজ-টুকু অব্যাহত থাকে। এর পর সরির জন্যে চন্নুর মার হাতে একটা কাঁসার বাটি: অ···অন্নদি···সরিরে দিয়েন, ছেমড়ির মাছ ছাড়া খাওন হয় না।

সেই সরির জন্যে সতুর কাঁকড়া শিকার। অভিযান। ডোবা থেকে মাত্র কয়েক মাস আগে সতু সরির জন্যে কাঁকড়া ধরেছিল। এখন সেই ডোবা আর নেই। মানুষের রুদ্ধশ্বাস কাজে, গঠনে, সেই ডোবা বুজে গেছে। সেখানে শালখুঁটি পোঁতা হয়েছে, বিশাল এক কারখানা হচ্ছে। ইতস্তত তেরপলের তাঁবু, ইটের উনুন, স্ত্রী-পুরুষের রঙিন কাপড় রোদে

পড়ে থেকে শুকোচ্ছে। ডোবা আর পুষ্করিণী ভরাট হতে-হতে এখন সামান্য জল কোথাও শুধু পায়ের পাতা ডোবায়। সেখানে দাগ কাটে ক্ষুদ্র জলপোকা, মৃদু কম্পন থাকে। দূর-দূর থেকে বুনো হাঁস এই জলাশয়ে উড়ে আসত। আর গত ছ-মাস যাবৎ ট্রাকের ঘর্ঘর শব্দ। লৌহশৃঙ্খল, জয়ধ্বনি, শ্রম-লাঘবের সমবেত বিহারি গীত, আর শাবল, গাঁইতি এবং ক্রেন। ক্রেনের শব্দ। হেলেঞ্চা, কলমি আর গিমেশাক নেই। নেই গল্পর বুনো-হাঁস শিকার। ক্রেনের শব্দ। কেবল ক্রেনের শব্দ। লোহার বিম্, লোহার শিকের ফ্রেম ইত্যাদি বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিয়ত ঘুরে চলেছে সিমেন্ট, বালি আর পাথরকুচি-মেশানোর যন্ত্র। ভারা বেয়ে উঠে যাচ্ছে নারী ও পুরুষ। শোনা যাচ্ছে বিচিত্র ভাষায় আহ্বান, উচ্ছ্বাস, আর নানাবিধ গল্প। উড়িষ্যাবাসী লিঙ্গরাজ, ঠিকেদারের হুকুমে কাজ করতে-করতে মাথায় ইটের পাঁজা সমেত ভারা থেকে উল্টে পড়ে। মরে। তৎক্ষণাৎ। খবরটা চাউর হওয়ায় মানুষটার নাম জানা গিয়েছিল, কিন্তু কাজ বন্ধ হয় নি। ক্রেনের শব্দ যেমনকার তেমন।

ক্যাওড়াপাড়ার ক্ষেমির কাটা ত্বক আর মুখের কুটিকুটি রেখা, ভাঁজ ও কুঞ্চনে ছিল এই ঘোষণা : বসুন্ধরা হল গে মা, রুষ্ট হয়েছে, হবে নি··· আগে ভক্তিছেদ্দা করে পুজোআচ্চা দে···টমেটম সাহেবেরও ভেদবমি হল বলে···

সন্তু দেখছে ক্ষেমিপিসির মুখে কাঁকড়ার পায়ের, দাঁড়ার, চেরা দাগ, হিজিবিজি আঁচড়। এইসব আঁচড় সামনে জাগিয়ে, মুখে নিয়ে, তার অলস চোখ নড়ে।

একদিন সবুর করে নি, একটা দিন রেহাই পায় নি। ক্রেনের এবং সেই মেশিনের শব্দই ছিল লিঙ্গরাজের অন্তিম বিদায়ে একমাত্র সম্মান। মজুরের দল হা-হুতাশ করে নি, করার সময় পায় নি। আর এখন তো কারখানা প্রায় শেষ হতে চলল। সেই কবে সে শালখুঁটির ওপর লোহার মুগুর পড়তে দেখে, গুম গুম শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করেছিল : হ্যাঁ গো এখানে কী হবে ?

ফ্যাক্টরি বনে গা।

ফ্যাক্টরি!

হাঁ, ফ্যাক্টরি নহী জানতা?

না।

কারখানা···ভোঁও—ও···কাম হোগা।

তুমি কোথায় থাক?

···ও···ওঁহা

না।

তব্ মুলুক? দেশ? ছাপড়া জিলা।

কোথায়? ছাপড়া কোথায় গো?

নহী মালুম! ইহাঁ সে হাবড়া, হাবড়া সে রেল···

সন্তু বস্তুত খুবই হকচকিয়ে যায়। হাওড়া, বিহার এ-সব সে চেনে না, কোথায়, সবই কি দেশ, একটি মাত্র দেশ, কত বড় দেশ! রেল-লাইনের উঁচু পাড় ছোঁওয়া ইট, সিমেন্ট, ক্রেন, লোহা-লক্কড়ের ভেতর হাঁটু ভেঙে বসেছিল ছেলেটা, আধা হিন্দি আধা বাংলায় কত কী যে শোনে···। ক্ষেতি। ভঁইস। গেঁহু। বারিশ।

ফলে তার বিশ্বাস হয়, দেশ সম্পর্কে কিছু জেনেছে। সরিকে সন্তু তার এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। গলুকে বলতে গিয়ে দেখেছে গলু অনেক বেশি জানে, কত জানে! ও তো একা-একা যাদবপুর চলে যায় লাইন ধরে। হাঁস মারতে। বলে—বানাকগো কত কারখানা বানাবে! কারণ গলু জানে, দেখেছে, পতিত জলাভূমির অভাব এদেশে কোনোও দিন হবে না।

সন্তুর আর কাঁকড়া শিকার করা হয়ে ওঠে না। কঞ্চিতে দড়ি বেঁধে সে যে গুগলির শাদা মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে-সবই ফেলে দিতে হয় 'ধ্যাৎ' বলে।

দিদি!

উঁ।

তোর শরীর খারাপ?

নাহ্‌রে।

জানিস··· কিছুতেই কাঁকড়া পেলাম না।

থাকগে।

ধ্যুৎ!

থাকগে, তুই এক কাজ কর, খাটের নীচে একমুঠো ভাত থালা চাপা দেয়া আছে, খেয়ে নে আগে।

আচ্ছা তোর লিঙ্গরাজের কথা মনে আছে?

কেন?

লিঙ্গরাজকে না···

চুপ কর তো, বড্ডো বকবক করিস আজকাল, যা খেয়ে নে··

আলোর সূক্ষ্ম রেণু ক্রমে অদৃশ্য, মরে যাচ্ছে, সুলতান আলম স্ট্রিটে বৃহৎ ধূসর ডানার বিস্তারে কখন সন্ধ্যা নেমেছে। এই সন্ধ্যায় মালিন্য নেই, রাতের সূচনাও নেই। দু চারটে গাছ, ডোবা ও তাবৎ জলাশয় বড় বেশি স্পষ্ট তাতে। ভাতের ফ্যান আর সেঁকা রুটির গন্ধে অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবার উৎকট ঝাঁঝও বিলীন। চন্নুর মার বিশৃঙ্খল চুলের গোড়া থেকে উড়ে আসছে নারকেল তেলের পুরনো গন্ধ।

অন্ন এখনো ফেরে নি, অন্নর ফিরতে আটটা বাজে রোজ তখন কাকামণিও ফেরে। সরি খাটে মড়-মড় শব্দ তুলে কাহিল শরীর নামায়, সতর্ক টেনেটনে দেয় পুরনো ফ্রক। পেয়ারাগাছের তলায় খানিক দাঁড়ায়, সেখানে পাগলা বাতাস। তার ছাড়া চুল ভাসায় সেই স্রোত। সন্ধ্যা।

চন্নুর মা আর উকিল ঠাকমা তখন লোকের নিন্দে করছে, দোক্তা খাচ্ছে। চন্নুর মার কড়াইয়ে ছ্যাক ছ্যাক শব্দ। উকিল ঠাকমা বলে: দিনে দিনে কত দেখবো!

নাহ্‌, মাসিমা আপনে ঠিক কইতেছেন না···

বলে ব্যাটাছেলে কাজ পাচ্ছে নাকো আর মেয়েছেলে···দেখোগে কোতায় কী কচ্ছে···

এই কথা কইয়েন না, অম্মদি সেই মানুষই না।

কত দেকলুম, বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

সরি এসে খাটের ওপর ঝাপটে পড়ল। ফোঁপাতে লাগল, সন্তু বহু বার সরিকে কান্নার বেগ হজম করতে দেখেছে, কিন্তু কাঁদতে দেখে নি, সে আস্তে-আস্তে সরির হাত ধরে টানতে লাগল : কী রে দিদি! কী হয়েছে? এই দিদি! বল না?

ওরা মার নামে···

কী ··কী···

বিচ্ছিরি সব কথা···সন্তু!

কী? কী কথা?

তুই বুঝবি না, বুঝবি নারে সন্তু···!

বল্ না!

তুই যে বড্ডো ছোটো সন্তু!

এই দিদি বল, বল বলছি, কেন, আমি বুঝি, সব, সবই বুঝি, বলে ভ্যাখ না, বল্ না।

ভগবান!

তা হলে আমি মরে যাব, এক্ষুণি মরে যাব, বল বলছি···

সন্তু জানে, জানত, ও ইচ্ছে করলেই মরতে পারে। স্রেফ ইচ্ছে। তাব সরি তখন বুকের কাছে টেনে নেয় তাকে : পাগল! কান্দে না! কান্দিস না ভাই·· পাগল···মরবি ক্যান! ক্যান মরবি সুনা! সন্তুর তখন বিশ্বাস সে মরবে না, কুট্টি বোনটা বোকার ডিম, তাই···।

চন্নু এখন শাদা ইউনিফর্ম পরে মর্নিং স্কুলে যায়, আর রাত আটটা বাজতে-না-বাজতে ঘুমে ঢুলে পড়ে। সন্তুর সঙ্গে তার দেখাশুনো বড় একটা হয় না। সন্তুর পাঠশালা বসে দশটায়, বিকেল তিনটে-চারটেয় ফেরে ফিরেই যা হোক কিছু মুখে দিয়ে ছোটে ক্যাওড়াপাড়ায়, না হলে গাংগুলি মাঠে কিংবা টো-টো করে ঘোরে, ক্বচিৎ বল খেলে। চন্নু আর সন্তুর মধ্যে এভাবে অনেক কিছু ঢুকে পড়েছে। তার ওপর চন্নু যে শক্ত শক্ত ইংরেজি শব্দের মানে জিজ্ঞেস করে : বল তো এলিফ্যান্ট মানে কী?

ভেলভেট।

তোর মুণ্ডু।

ভাগ, ভেলভেট।

এলিফ্যাণ্ট মানে হস্তী···

হস্তী আবার কী?

হাতি।

সুতরাং চন্নু ধারে কাছে এলেই সন্তু জোরসে চিমটি কেটে দেয়, এখন কাকীমার সন্তুর প্রতি অযৌক্তিক প্রশ্রয় থাকায় ও-নিয়ে নালিশ ঠুকে চন্নুর কোনো লাভ হয় নি। উল্টে মার খেয়েছে। সম্প্রতি দু-জনের মধ্যে কথা বন্ধ আছে।

সন্তুর এখন ইচ্ছে করছিল চন্নুর পাশে গিয়ে বই খুলে বসে। কিন্তু উপায় না থাকায় তাকে লম্প জ্বালতে হয়: দেশলাইটা কোথায় রে দিদি?

ঐ তো বালিশের নীচে।

সন্তু অঙ্ক করবে ভেবে, পরক্ষণে বিস্মৃত হওয়ায় হাতির ছবি আঁকতে থাকে। এবং কিছুতেই শুঁড়টা বাগে আনতে পারে না, ক্রেনের মতো কিছু একটা এঁকে ফেলে বারবার।

অন্নর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। সামান্য শব্দে সন্তুর কেবলই ভ্রম হতে থাকে, আবার বারবার ভেঙে যায় সেই ভুল আর ভঙ্গুর এই আকাঙ্ক্ষার শহিদ হতে-হতে ক্রমে দাম হাই ওঠে। সরি বটতলার ভুসো মলাটের বই কাত করে হুঁশিয়ারি দিল: এই ভাই ঘুমাইস না···মায় আইল বইলা···পদ্য মুখস্থ হইছে? মুখস্থ কর নাইলে কানাইদায়···। তখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত সন্তুকে চীৎকার করতে হয়: মন্বন্তরে মরিনি আমরা···। যদিও তার চোখ দুটো ইতিমধ্যে লাল হয়ে উঠেছিল, আসনপিঁড়ি হয়ে বসার ভঙ্গিটি ঢিলে হচ্ছে ক্রমে এবং শেষে একটি হাতের ওপর নিজের গাল স্থাপন করে পরম নির্ভরতায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়।

অন্ন, এখুনি এসে যাবে, এসে গেল প্রায়। আর অন্ন এসে গেলেই সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ। সে, সরি এবং অন্ন দীর্ঘকাল পরস্পরে সীমাবদ্ধ,

অভ্যস্ত। কেমন অখণ্ড মনে হয়! যাতে সে ভাবে আদিতেও যেন এই তিনটি প্রাণীই ছিল চরাচরে। আগে সে নিরুদ্দিষ্ট পিতা এবং অন্য প্রিয়জন যথা চন্নুকেও ধরে নিত। কিন্তু অন্ন এবং সরির বুঝদার 'আমাগো', 'আমাগো তো অগো মতো চলবো না', ইত্যাদি কথায় বুঝেছে, এই আমরা বড়ই পৃথক, অখণ্ড গ্রন্থনায় নিবিড় তিনটি প্রাণ॥ এখন, এমন-কি তা অনুভবেও স্থায়ী। তারা মন্বন্তরে মরে নি, কোনোদিন মরবে না। সতুকে পদ্য মুখস্থ করতে-করতে ভাবতে হয়: তা হলে মন্বন্তরে কারা মরেছিল? কারা বেঁচেছিল? কেউ কি মরেছিল? তারা কারা? তারা কেন মরেছিল? মন্বন্তরে!

পঞ্চাশ সন…

সন্তানের মুখের গরাস মায় কাইড়া খাইতাছে…।

অন্ন দেখেছিল। স্বচক্ষে। নিজের চোখে অন্ন দেখেছে। আর সতু তো এখন ছাপার অক্ষরে দেখছে, কেবল সনটাই লেখা নেই। না থাকগে, পঞ্চাশ সনই হবে। নাকি বহুবার? সে যাই হোক, ছাপার অক্ষর মানেই 'বিদ্যা', 'বিদ্যা' মানে 'সত্যি', সত্যি মানে যা সত্যিসত্যি হয়েছে, হবে। তা হলে মন্বন্তর হয়েছিল। কিন্তু আমরা মরিনি। শুধু কুট্টি বোনটা মরেছে। কিন্তু আবার যদি মন্বন্তর হয়, তা হলে? তা হলেও কি আমরা আবার বেঁচে যাব? কতবার বাঁচব?

সতু!

এই ডাক সেই নারীর, যার জন্যে সতুর বই খুলে বসে থাকা, পড়া, পড়ার চেষ্টা করা। কারণ বাড়ি ফিরে সতুকে এ-অবস্থায় দেখলে অন্নর শরীরে নিঃসৃত হতে থাকে সেই রস, মমতা।

ওঠ্। খুব হৈছে। অখন খাইয়া লও।

মা! অমা!

কী?

যোগেন্দ্র, মহেন্দ্র হরেন্দ্র চক্রবর্তী…

কী কস হাবিজাবি, পূর্বপুরুষের নামে ঈশ্বর বসাইতে লাগে।

আচ্ছা ওরা সবাই মন্বন্তরে মরেছে না?

শোনিস নি সার! হ্যাগো কত ধান! কত জমিজমা! তগো বাড়িতে রোজ না হৈলে দশজন চাষা খাইয়া যাইত! নে অখন ওঠ, খাইয়া ল দেখি, মেলা জ্বালাইস না, অ সরি তরও দেখি ঘুম লাগল, ওঠ।

কোনোক্রমে খেয়ে নিয়েই সন্তু ডুবে যেতে থাকে, তার শরীর কোথা-ও নেমে যেতে থাকে অতি দ্রুত। এলিয়ে যায় ঘুমে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না, কিছুই থাকেনা। শুধু রাতের দাপট।

মরে নারী, ওড়ে ছাই
তয় নারীর কলঙ্ক নাই ॥

অন্ন সম্পর্কে কেচ্ছার গল্প করতে এসে তিনবারের বার উকিল ঠাকমা চন্নুর মার কাছে নিদারুণ অপদস্থ হয়ে ফিরে গেছে। একমাসের ওপর আর এ-রাস্তা মাড়ায় নি। কাদা ও জলো গন্ধের ক্যাওড়াপাড়া, সুলতান আলম স্ট্রিট আর শান্তিপল্লীর তিনটি কোণ জুড়ে, সেই কেচ্ছা এই এক-মাসে বিস্তৃত। কেচ্ছাটির পাখা গজিয়েছে। মাত্র একমাসের মধ্যেই তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এমন-কি, এখন কোথাও তার সূত্রপাতে অন্নর জন্যে সহানুভূতিও থাকে : আহা নিঃসম্বল বিধবা, তা যা হোক করে তো ছেলেমেয়ে দুটোকে দাঁড় করাতে হবে। তার পর তারা নিবিষ্ট হয়। কেচ্ছা জমে ওঠে। আবিষ্কৃত হয়ে যায় অন্ন রাত করে ফেরে। কখনো-কখনো ফেরে না। যে বা যারা তাতে সংশয় প্রকাশ করে, আদতে তারা আরো নির্দিষ্ট তথ্য চায়, প্রমাণাদি চায়। অথচ সকলের মুখে ও পরিস্থিতিতে কী ঔদাসীন্য! তারা এক নিঃসম্বল বিধবার উপায়হীনতায়, নির্যাতনে ক্লিষ্ট। যেন-বা সেই শোক তারা ভাগ করে নিচ্ছে। এজন্যে সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যে আছে অন্নর পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হওয়া। এই তথ্যটিতে তারা গুরুত্ব আরোপ করেছে, যদিও পঁচিশ বছর বয়সের অন্নকে তারা কখনো দেখে নি। কিন্তু ঐ বয়সের মাহাত্ম্য, ঐ বয়সে বিধবা হওয়ার করুণ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ বলে খেদ থেকে যায়। তখন দিব্যচোখে পঁচিশ বছরের অন্নকে দেখা যায়। সামান্য চেষ্টাতেই এ-কথাও আর গোপন থাকে না—সরির বাবা মৃত্যুমুখে ঠায় দু-বছর পড়েছিল। বিশেষ, ঐ ব্যক্তি ক্ষয়রোগে অনেক সময় নিয়ে মারা গেছে। ফলে যে দৃশ্যটি তারা নির্মাণ করে তাতে ঐ যৌবনবতী নারী ও মৃত্যুর নির্দয় ক্ষরণ ক্রমে মিশে যেতে থাকে।

এই বৃত্তান্তের অনিবার্য ডালপালা একসময় মাটকোটা স্পর্শ করেছে, যদিও তার আগে এবং পরেও, যথেষ্ট আড়াল ছিল। আড়ালের চেষ্টা ছিল। অন্ন ও সন্তুর ক্ষেত্রে ঐ চেষ্টা সার্থক, কিন্তু সরি সবই জানত। চন্নুর মা সরির কাছে কিছুই গোপন রাখে নি, অন্নর অনুপস্থিতিতে সে বলেছে : অরা নাকি ল্যাখাপড়া জানে···এইয়ার নাম শিক্ষা···খাম্‌কা একটা মাইয়া-মান্‌ষের নামে···ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

এরকমই হয়ত চলত, শান্তি-পল্লীর সচ্ছলতায়, বাজারের ভারি থলের হাঁটাচলায়, কেচ্ছার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু বিপত্তি হল সন্তুকে নিয়ে, ক্যাওড়াপাড়ায় মেলামেশার সুবাদে, গলুর সঙ্গে মাখামাখি থাকায়, ঐ অপবাদের একটি প্রতিশব্দ সে জেনে ফেলে। কিন্তু শব্দটির অর্থ তার জানা ছিল না। সমুদ্র, পৃথিবী ইত্যাদির মতো সন্তুকে তখন 'খানকি' শব্দটির অর্থ জানতে হবে, ঐ শব্দটি সে চিত্রময় করে নিতে চায়। অন্নর কাছে সন্তু অর্থটুকু জানতে চেয়েছিল। সরি তখন অ-কল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় তাকে জাপ্টে ধরে, অন্ন রুদ্ধশ্বাসে জেরা করে চলে শব্দটির উৎসে যাওয়ার জন্যে : কে কইছে? কার থিকা···ক···ক···কে? কে? কার থিকা শুনছস? কে কইছে?

অন্ন যার খোঁজ করছে, প্রতিবারের জিজ্ঞাসায় তার প্রতি যে-বিদ্বেষ দাঁতে, চোয়ালে ও চোখের তারায় ঝলসেছে, তাতে সে খুন হয়ে যেতে পারত। অন্ন তখন খুন করতে পারত। প্রলয় তার শরীরে তখন ছত্রখান। সপাটে আছড়ে পড়ছে বিশুদ্ধ ক্রোধ, হঠাৎ স্তব্ধ হলে ক্রোধই তাকে খাড়া করে রাখে। জ্যোৎস্নায়, রাতে। আর ঝিঁ ঝিঁ ডেকে যায়। সমস্ত জিজ্ঞাসার খননকার্য সমাপ্ত করে তিনটি নারী তখন সেই কেচ্ছার গলিত শব টেনে তুলেছে, তাদের হাতে পচা মাটি, গলা মাংস আর দুর্গন্ধ। শিকড়-আঙুল তাদের মুখ, চোখ খুবলে নিচ্ছে। ক্রমে তারা নিস্পন্দ, স্থাণু। কোথাও কোনো শব্দ হয় না, এক ঐ ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া, ফলে অপার সময়ও তাদের বৈরাগ্য দিতে থাকে।

চন্নুর-মা-দিদি, আপনের আশ্রয়ে থাকন আমার কপালে উঠল···

কই যাবেন!

যে-দিক দুই চক্ষু যায়···

আপনে থামেন···

আর চন্নুর মা সেই জ্যোৎস্নায়, হিমে, সমগ্র পরিস্থিতির ক্রোধ আত্মসাৎ করে এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে ফেলে। জানা যায় এই অপবাদের উৎসে পৌঁছে গেছে সে। সে জানে, জানে বলেই ঐ জিভ উপড়ে ফেলা তার আশু কাজ। আর এজন্যে করণীয় কোনো কিছুতেই তার আটকাবে না, এমন-কি জেল হাজত করতেও তার আপত্তি নেই। আর একেবারে ঠাণ্ডা মাথায়, অবলীলায় সে খুনের কাজটা সেরে ফেলতে পারবে, কারণ তা হবে অতিমাত্রায় স্বাভাবিক। সে আরো বলে: মনুষ্যত্ব নাই, হোয়ামি টাকার আগুিল আইনা দিতাছে, হ্যার আর কী! মাগির জিভখান খুইলা ন্যাওন লাগে···

আর হোয়ামিও একেরে ভ্যাড়া ···

এরকম মানুষের জিভ উপড়ে নেওয়ায় কোনো অন্যায় তো নেইই বরং তা পুণ্য। চন্নুরমা এই পুণ্য কাজটি অতি দ্রুত সেরে ফেলবে। অন্ন দেখতে পাবে।

তখন অন্নর স্মরণ হয়, চন্নুর মা ক্রোধ দমনে অক্ষম, নিজের স্বামীকে একবার থালা ছুঁড়ে মেরেছিল। কাকামণির কপালে সেই কাটা দাগ আজও গভীর হয়ে আছে। অতএব চন্নুর মাকে নিরস্ত করার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এত-সব কিছুর ভেতর সতু এবং সরির কথা খেয়াল রাখে না ঐ দুই নারী। পুনরায় একটি প্রবাদে অন্ন তখন স্বাভাবিকতা ফেরত পাচ্ছে : মরে নারী ··

একসময় সে গল্পও বলে। যে গল্পে জানা যাচ্ছে অন্ন তেমন হলে আজ সরি আর সতুকে নিয়ে তার হেনস্থা হত না। কাহিনীর সেই খলনায়ককে সতু আর সরি চেনে। জ্যাঠামণি অন্নর সেবা-যত্নের নামে আরো ঘনিষ্ঠতা চেয়েছিল। জ্যাঠামণির তখন অসুখ, সেই অসুখের সময় অন্নকে তার সেবা করতে হয়েছিল কর্তব্যজ্ঞানে। সতুর বাবাও তখন বেঁচে, কিন্তু ক্রমশ সে চলে যাচ্ছিল মৃত্যুর দু-পাটি অত্যুজ্জ্বল দাঁতের মধ্যে। অন্ন পারে নি জ্যাঠামণির সঙ্গে রফা করতে। অথচ সেই রফায়

জরুরি ব্যবসা ছিল, বাস্তব ও আখেরের বোধ ছিল, ছিল অতিমাত্রায় সরল একটি অঙ্কের হিসাব। এখন সে কেবল অপারকতার কথা, অনিচ্ছার কথাই জানিয়ে যাচ্ছে। এই স্মৃতিচারণে কোনো ঘোষণা নেই, তা কেবল বিরতি। এ বিষয়ে সতীত্বের অনুষঙ্গ ছিল না। অমোঘ সেই ছড়াটি অম্ল উচ্চারণ করেছে, যাতে কলঙ্ক না থাকাটাই বাস্তবে অসম্ভব। কলঙ্ক তাদের জীবনে ওতপ্রোত আছে এই উপলব্ধিতে শরীর এলো করে দিচ্ছে। এমন-কি এসে যাচ্ছে মৃত্যু। চমুর মাকে-ও ছেড়ে যাচ্ছে ক্রোধ। ঘামছিল। ঘাড় নাড়ছিল।

রাতে এক নিদারুণ ভয়। ক্রমে আতঙ্ক। আর সেই আতঙ্ক পরে নিদ্রা হয়ে গেলে, সন্তুর কোনো প্রতিরোধ থাকে না। কেবল পরের দিনের যাবতীয় ছক প্রাকৃতিক কারণেই যেন-বা হুবহু ঘটে যেতে থাকলে, সে একবার ক্যাওড়াপট্টির দিকে এগোয়। যেখানে রোদ হাভাতি চোয়ালে ঝুলে ছিল। ঘষা চামড়ায় আলোকিত বিশ্বগ্রাসী খিদে। বইশ্লেট বগলে নিয়ে সন্তু গলুর সঙ্গে বেরিয়ে যায় কোনো দূর স্টেশনের উদ্দেশে। গলুর পকেটে যথারীতি গুলতি আছে। ফাঁকা ট্রেনের কামরায় জাঁকিয়ে বসে গলু সিগারেট ধরায় : টানবি ?

নাহ্।

কেন ?

নেশা হয়ে যাবে, গন্ধ হবে মুখে।

গন্ধ হবে ! কিস্সু হবে না, টান, তুলসীপাতা চিবিয়ে খাবি ব্যাস···

কারখানার শেড ও পাকাবাড়ি ফেলে কয়লার ইঞ্জিন তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সন্তু একগাল ধোঁয়া ছাড়ে, কাশে। হরিৎ ধানখেতের পাশ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটছে, সন্তুর আতঙ্ক, বিস্ময়ও। সে আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবে না, ফিরবে না।

ফেরার পথে গলু চেকারের খপ্পরে পড়ে যায়, আনাড়ি সন্তু সমর্থ হয় এক লাফে পালাতে। অনেকবার ভুল রাস্তায় হেঁটে ক্যাওড়াপট্টির ভেতর দিয়ে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে। গলুর দাদা ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল। সাইকেল কারখানা থেকে ফিরে শ্যাম নিয়মিত এই সময় যন্ত্রটা নিয়ে বসবে।

রণদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সন্তু রণ ও তার ঠাকমার এরকম সংলাপ শোনে :

মন্নু !

কী···ই ··ই।

ক্ষুদা লাগছে ?

নন না

কী ?

মুখখান শুখনা দেহি···

রুটি চেয়ে এনেছ ঠিক··

ক্যান, ভিক্ষুক না কি !

তা হলে আনো ক্যানো ?

সাধা অন্ন পায় ঠ্যালতে নাই···শোন তয়, আমগো দ্যাশে···

হৈছে ! ভিক্ষুক !

কী কইলি আমি ভিক্ষুক···

রণর ঠাকমার গলায় ও বুকে তখন পুরনো শ্লেষ্মা ঘর্ঘর ঘর্ঘর করছে, হঠাৎ সে কথা বলতে পারে না। অথচ কথা বলার চেষ্টা ছিল বলে ঐ ঘর্ঘর ধ্বনি সম্ভবত খানিকটা শ্লেষ্মা তুলে আনে। বৃদ্ধা কথাটা মানতে পারে না। সে বিশ্বাস করে না। যদিও ট্রাম-লাইনের ধারে, রাস্তায়, কেউ কেউ তাকে সত্যিই ভিক্ষে করতে দেখেছে। রণর মা ও বোন এখন ঠিকে ঝির কাজ করছে। আর রণ যেন বুঝতে পারছে তারা ভিখিরি হচ্ছে, ক্রমে তারা ভিখিরি হয়ে যাবে। যেজন্যে তার চীৎকার। জ্বলন্ত খিদেয় সে বরং নিজের পাকস্থলী পুড়িয়ে ফেলবে। বস্তুত সন্তু ঘাবড়ে যেতে থাকে, গলুকে চেকারে ধরার বিপদ গৌণ হয়ে যায়। ভিন্ন এক ভয় ক্রমে স্ফীত ও পরিণত হয়ে উঠছে। অবোধ, ভয়ংকর। ক্যাওড়াপট্টির অশ্বত্থ গাছের মগডালে যেন সেই আতঙ্ক উলঙ্গ ঠ্যাং ঝুলিয়ে রেখেছে। মাটকোটায়, শুকনো পেয়ারাপাতার চোরা ঘূর্ণিতেও যেন ঐ একই আতঙ্ক। এই আতঙ্ক চতুর্দিকে আগুনের বেড়াজাল। কোথাও আগুন

জলছিল। সেই দাহে যেন-বা অর্ধদগ্ধ নিষ্ক্রমণও আছে। মা কি ফিরে এসেছে? অন্ন কি জেনে গেছে সন্তু ইস্কুল-পালায়? প্রায়ই ইস্কুল-পালায়, কোথায় যেন পালায়! পালিয়ে গেলে কি এসব আর থাকবে না? দারিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি কিছুই থাকবে না?

সন্তু জানত না ঐ পলায়ন আদতে নিষ্ক্রমণ। যেমন সে জানত না গলু কেন তার কাছে হিরোর মর্যাদা পেল। আজকাল কেমন এক রুক্ষ মেজাজ তার ভেতর জাল বুনে চলেছে। সন্তু বড় অনভিজ্ঞ। সে জানেনা, কিছুই জানেনা। কেবল জ্বালা করে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল রেল-লাইন, সিগন্যাল। যেখানে যত ঝুঁকি ও বিপদ, সেই-সব জলাশয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্যে সে শূন্যে লাফিয়ে উঠতে চাইছে। তাতে যেন চূর্ণ হয়ে যাবে সমস্ত অন্ধকার, অজ্ঞান। প্রত্যক্ষ শারীরিক আচরণ ও অত্যাচারে সে যেন তা সম্ভবও করতে পারে। অনুতাপও আছে: গলুর সঙ্গে তারও কি ধরা পড়া উচিত ছিল না? কেন সে চলন্ত গাড়ি থেকে মারাত্মক লাফ দিয়েছিল?

কারখানার কাজে, ওভারটাইমে, অন্ন যত চাপা পড়ে যাচ্ছে, সন্তুর প্রকাশ যেন ততোই প্রতিদিন বৈচিত্র্য ও দুঃসাহসে অত্যুজ্জ্বল, দ্যুতিময় হয়ে উঠছে। এক তো সে অভিভাবকহীন, ছত্রহীন দীর্ঘ সময় পেয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে বিপর্যস্ত থাকায়, ক্লান্তি থাকায়, অন্নকে সে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে দেখে না। বড় তাড়াতাড়ি অন্ন ঘুমিয়ে পড়ছে। আর ভারতবর্ষ বিষয়ে সন্তুর ভূগোলের ধাঁধাঁটিও এতে করে ক্রমশ তরল। গুহ্য রহস্য যা ছিল তারের ধাঁধাঁর মতো, অবিরত নাড়া-চাড়ায় সেই জট খুলে যাওয়ার বিস্ময় ও আনন্দ আছে তার।

এই ধাঁধাঁয়, ভূগোলের পাঠে, সে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে সর্বদা দু-হাতওয়ালা কামিজের আকারে দেখেছে। কামিজটির বুক পকেটে বাংলাদেশ গচ্ছিত রয়েছে। ঐ কামিজটা আবার সেঁটে দেওয়া হয়েছে পাঁচ নম্বর ফুটবলের গায়ে, ফুটবলটিতে কোনো লেস নেই। ভূগোলের একটি সূত্রে বলা হচ্ছে এই গোলকটি অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু মানুষ কখনো ছিটকে পড়ছে না, এরকম তাজ্জব কাণ্ড আছে। এই আশ্চর্য ছাড়াও সন্তুর কাছে বিষয়টি আরো ধাঁধাঁর কেননা মানচিত্রের কোথাও

সে সুলতান আলম স্ট্রিট খুঁজে পায় নি।

অথচ তার বিশ্বস্ত জ্ঞানে সুলতান আলম স্ট্রিট কি পুরো বাংলাদেশে কীলকের মতো প্রোথিত নয়?

সত্তু জানে, জেনে গেছে, ডানদিকে জলার ওপাশে গুলতি ছুঁড়লে সেই উধাও ঢিলের গতি থাকবে রেল-লাইনের দিকে, তার পর লাইন ছুটছে···ছুটছে···যাদবপুর···সোনারপুর···কালিকাপুর···চাম্পাহাটি। সে এমন-কি ইদানীং জেনেছে, মানচিত্রের ঐ কারিজটি উড়োজাহাজে চেপে সংগ্রহ করা হয়েছে। আর একইভাবে জানা গেছে পৃথিবী ঈষৎ চাপা একটি কমলালেবু, বা ন্যাসপাতি। সমস্যা হল সত্যিকারের পৃথিবী কি তা হলে কেবল আকাশ থেকেই দেখা যায়? অতদূর শূন্য ছাড়া কি কিছুই দেখা যায় না?

রণদের বাড়ি অতিক্রম করতে তার তেমন সময় লাগে না। ক্ষেমির মুখোমুখি হয়ে নিদারুণ সত্য জানিয়ে দেয়: গলুকে চেকারে ধরেছে। প্রত্যুত্তরে ক্ষেমি তার মাথায়, অবিন্যস্ত চুলে হাত বোলায়। এমন চুপ থাকে যেন বিষয়টার কোনোও গুরুত্ব নেই। যেন ঐ তথ্য তার না জানলেও চলত। ফলে সত্তুকে আবার জানাতে হয়। এতে ক্ষেমি গলুকে উদ্দেশ করে প্রশ্রয়ের সুরেই বলে যায়: হবে না···য্যামুন গ্যাচে··· বড়ো তেল হয়েচেলো···ওর শিক্ষে হওয়া দরকার···আস্লুগগে অ্যাকুন জেল খেটে···

এবং হেসে ফেলে। গলুর দৌরাত্ম্যের গপপো বলে চলে, 'জম্মে থেকে ওর ঐরম ধারা'···। এতে প্রকাশ পায় গলুর ধরা পড়ায় ক্ষেমি খুশি, সে যেন এই ঘটনায় গলুর সাবালকত্ব দেখতে পাচ্ছে; গলু তার বয়স ও প্রকৃতি অনুযায়ী অত্যন্ত স্বাভাবিক, অথচ এক দুঃসাধ্য কাজে লেগে গেছে। ক্ষেমি আরো বলে, 'তুমি ওর সঙ্গে মিশোনি বাবা, ও একটা নচ্ছার···মা-বোন ভাবছে, এব্রে বাড়ি যাও!' এই কথায় হয়ত বা নির্যাতন ছিল, ছিল সত্তু সম্পর্কে সস্নেহ তিরস্কার। গলুর কাছে, গলুর তুলনায়, তাকে খাটো দেখায়। ফলে, সত্তুর মনে হয় ট্রেনের কামরা থেকে ঐ ভয়ংকর লাফ দেওয়াই তার স্খলন ও পরাজয়ের মূল কারণ।

অন্ন হয়ত এখনো ফেরে নি। সন্তু দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করে, না হলে তার কীর্তিকলাপ সরি ফাঁস করে দেবে। এমনিতে সরির কাছে সে কলঙ্কের অংশবিশেষ, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সন্তুর মঙ্গলামঙ্গল জড়িত, দূরদর্শী সরি এ-সব ক্ষেত্রে বডডো শক্ত। তখন আর মায়া-ফায়া থাকে না। এই তো সেদিন অন্ন আসতেই—জানো মা সন্তু না আইজ ইস্কুল পলাইয়া···। তালপাতার আস্ত একটা পাখা সেদিন সন্তুর পিঠে ফর্দাফাই হল। আর দুঃখের গাজনের সূত্রপাত, 'আমার কপালে সুখ ল্যাখে নাই—।' তখন সরির মুখে চিবুকে ক্রমে নীল মেঘ স্তূপীকৃত, অন্নর পায়ের নখ খুঁটে সে ময়লা তুলে যাচ্ছে। সরির তখন এইসব স্বগোতক্তি : না বলেই বা কী করব? সন্তুর তো একটা ভবিষ্যৎ আছে?

আর এখন, এক পলক মাকে দেখেই সটান খাটের কাছে চলে যায়, নিশ্চুপে। কিছুটা সিঁটিয়ে ছিল সে, যেহেতু ভবিষ্যৎ জানত না। অথচ অন্ন আজ বকাঝকা করল না, আজ সে বড়ই প্রসন্ন। এমন-কি গুন-গুনিয়ে সে দেহতত্ত্বের একটা গানও গেয়ে যেতে থাকে। সন্তু হাত-পা ধুয়ে এসে দেখে সরি এক কোণে বেজায় আলগা হয়ে পড়ে আছে, চোখ দুটো খোলা কিন্তু কিছুই নজর করছে না। অন্নর গলায় যখন শব্দ তরল ও মসৃণভাবে গড়াচ্ছে : ল, এই সন্দেশখান খাইয়া ল—বুঝলি সন্তু, দিদির বিয়া ঠিক হইয়া গ্যাছে···। সন্তু অন্নর কথাটাকে শেষ করার ফুরসৎ না দিয়ে সরির হাত ধরে টানতে থাকে : হ্যাঁরে দিদি! তোর বিয়ে?

চুপ কর।

দই রসগোল্লা হবে!

চুপ কর।

বল না?

চুপ কর সন্তু!

সশব্দে সন্তুর গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয় সরি : চুপ কর! এতে কর্কশ আদেশ ছিল, সন্তু অমান্য করতে পারে না।

হারামজাদির জ্যাদ কত! আমি ভাবতাছি কোথায় ভাত-কাপড়ের কষ্ট ঘুচল আর উনি কাইন্দাই কুল পান না—

সরি এক কোণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন সে প্রার্থনা করছে একটি কঠিন আচ্ছাদন। যেখানে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে, আত্মগোপন করতে পারে। কী এক ভীতি সশব্দে হামলে পড়ছে সরির 'পর, যেজন্যে তার শরীরের ঐ ভঙ্গি—হাঁটু দুটো টেনে নিয়েছে নত মুখ, ফলে তার বুকও আচ্ছাদিত। তার শরীর তখন নির্ভেজাল ভীতি, আতঙ্ক। অন্ন উঠে যেতেই সতু দিদির কাছে সরে আসে, চোখে অপার জিজ্ঞাসা, আর একই ভীতি।

সত্যি!

কী?

তোর বিয়ে হয়ে যাবে?

জানি না।

বল না?

সতুর এই জিজ্ঞাসায় আর উচ্ছ্বাস নেই বরং সে যেন নেতিবাচক উত্তরই চাইছিল। যেন-বা সে হঠাৎ টের পেয়েছে সরির আতঙ্কের মূল ও কাণ্ড। দিব্য-চোখে প্রত্যক্ষ করছে যাবতীয় বিষণ্ণতা এবং নিঃসন্দিগ্ধ যে দিদির বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

বিয়ে দিলে আমি মরে যাব—দেখিস—দেখিস—

সতুর ক্ষমতা ছিল না আর এই নির্যাতন ধারণের। কারণ সে কিছু না হলেও এই আদত সত্যটিতে বিপদগ্রস্থ। আশৈশব যেখানে যতটুকু স্মৃতি ও কল্পনা আছে সর্বত্র সরির রুখো চুল উড়ছে তো উড়ছেই। 'মার মতো আমিও তো কাম নিতে পারি', সরি নিজের সম্পর্কে ভাবনার এই কথাটুকু বলে। তা হলে ভাত-কাপড়ের তেমন সমস্যা হবে না, সরি জানে, সঙ্গে-সঙ্গে সে তো জানে অন্নর আশংকা আরো কত গভীর! অন্ন কত দূরদর্শী। কাজেই তাদের এই একাগ্র আলাপে সতু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ঘোষণা করে, 'তোকে বিয়ে করতে হবে না'। সরি জানে তা কত ভঙ্গুর, অপরিণত। সতু যদিও একটানা বলে যেতে থাকে তার বড় হওয়ার গল্প, যে গল্পটি সে নিজেই বানিয়েছে, যে-গল্পে সরি আনন্দিত হয়ে ওঠে, অথচ গল্পের সঙ্গে সতুর দৈনন্দিন কার্যাবলীর, বিশেষত ইস্কুল-

পালানোর বৈরিতা আছে। সরল বিশ্বাসে সন্থ সেই গল্প বলে চলে, 'দেখিস না, আমি লেখাপড়া শিখে চাকরি নিই তার পর—'

পাক্কা দেড়মাস পরে গলু ছাড়া পেল। দিন কতক শ্যাম খুব দৌড়োদৌড়ি করেছিল, তার পর ক্যাওড়াপাড়ার স্থায়ী রীতিতে আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছে। প্রাণে বেঁচে থাকলে একদিন-না-একদিন ঠিক ফিরে আসবে। আসেও, দুটো পয়সা কামাতে জোয়ান বয়সে কেউ-না-কেউ এ রকম হাপিশ হয়েছে আগেও, আর একসময় তারা চাট্টি মনিহারী দ্রব্য-সমেত ফিরে তামাম পাড়ায় হাল্লা জাগিয়েছে। হয়ত-বা ঐ মানুষটার কথা সরল ও বিবাগী এই পাড়া ভুলতে বসেছিল তদ্দিনে, ততোদিনে নিজস্ব ঝঞ্ঝাট ও সংকটে তারা ভুলে গিয়েছিল ঐ ব্যক্তির তাবৎ স্মৃতি। মাত্র দেড়মাসে গলুকে কেন্দ্র করে ক্যাওড়াপাড়ার সেই অভ্যস্ত উদাসীনতা এসে গেছে। এমন-কি সন্থর অপরাধ-বোধও বেশ ফিকে হয়ে এসেছিল, যদিও নির্বান্ধব সে ভারি পা ফেলে হাঁটা-চলা এবং নিয়মিত ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া ইত্যাদিতে কেমন নিস্তেজ। তখন হঠাৎ···এক-মাথা চুল, খুস্কি আর চুলকানি নিয়ে গলু ফিরে আসে সন্থর শান্ত ও ক্রমিক বড় হওয়ার কুসুম-কণ্টক বিন্যস্ত অধ্যায়ে শনিগ্রহরূপে অন্ন যাকে গণ্য করে থাকে, নির্দয় শাপান্তে অন্ন যাকে খল ও অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে : সন্থ অর লগে যদি আর একদিন-ও দ্যাখছি···। তারপর সে বর্ণনায় তুলে ধরত দুটি জীবন-চিত্র : গলুর জন্যে কল্পিত, অবশ্যম্ভাবী, সেই চিত্র বড় নিষ্করুণ, তাতে কঠিনতম মেহনত থেকে করুণ ভিক্ষাবৃত্তি, এমন-কি চুরিচামারির কথাও বাদ যেত না। ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সন্থ ঐ চিত্রটিকে ধিক্কার দিতে পারে নি অন্নর মুখোমুখি। নির্দয় ও ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ তখন সন্থকেই আশ্লেষে টেনে নেবে বলে নয়, আসলে সন্থও টের পায় গলুর ললাটে কালো মেঘ, মেঘপুঞ্জ। তাছাড়া সত্যিইতো গলু লেখাপড়া করে না। আর এই লেখাপড়ার ব্যাপারটাই সমস্ত সুখের মূল, প্রধান শিকড়। আতঙ্কে ও সংস্কারে সন্থর চেতনায় ঐ শিকড় প্রবিষ্ট। এত গভীরে চলে যাচ্ছে এই পীড়ন যে সে বাৎসরিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আরামপ্রদ, নিশ্চিত ঘুম থেকে বঞ্চিত করেছে নিজেকে, অন্তত

একটি রাত। এই বঞ্চনায় মস্তিষ্কে বিচিত্র রসের ক্ষরণ হয়েছে আগামী-সচ্ছলতার নিশ্চয়তা ছিল ঐ রসে। ক্রমে এই বিশ্বাস আসছিল, সে নিজেকে বিভক্ত করে নিতে পারছে। এক দিকে আছে তার দৌরাত্ম্য, দুর্বার গতি ও উচ্ছ্বাস, যাতে সে মুক্ত, আনন্দিত। অন্য দিকে টপাটপ বাৎসরিক অগ্রসর, মসৃণ ও সুনিশ্চিত প্রশংসা, ইচ্ছাপূরণ ও অস্পষ্ট আরো সুখ।

গলু ফিরে আসে থুতনির ওপর লম্বা একটা কাটা দাগ নিয়ে, 'লপ্‌সি খেতুম বুঝলি···।' গলু আরো অনেক কথা বলে, মামলা, আইন-আদালত, পুলিশের গন্ধ, লাঠি ও হাজতের পেচ্ছাপস্রোত। গলুর তিনদিনের মধ্যে ছাড়া পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জি. আর. পি. কেস খাইয়ে দিল। সে তখন জি, আর, পি, কেসের গল্প সোৎসাহে বলে চলে ; বীরত্ব, অভিযান, রোমাঞ্চ ইত্যাদি গোপন থাকে না। গলু তখন মহান।

কালিকাপুর লাইনে ওয়াগন-ব্রেকাদের সঙ্গে জি. আর পি. দারোগার সাট্টিল আছে···মালগাড়ি লুঠের মামলায় গলুকে খামকা জড়িয়ে দিয়েছিল। ওর চোখের সামনে এক মস্তান পেচ্ছাপের মামলা লিখিয়ে পাঁচটাকা ফাইন দিয়ে খালাস পেয়েছে। এই বৃত্তান্তের সঙ্গে-সঙ্গে গলু সন্তুকে কারখানার শেডের তলা দিয়ে খানা, ডোবা আর জলা মাঠের দিকে প্রসন্ন মেজাজে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

একসময় সন্ধে উতরে যায়, গলুর নাকের সামনে তখন নীল জোনাক-পোকা। খপ্ করে গলু পোকাটাকে ধরে ফেলল। আর হঠাৎ নিষ্ঠুরতা চড়াও হয় গলুর শরীরে। পোকাটাকে শেষ করে ফেললে থুতনির কাটা দাগ ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে।

ফেলে পালালি কেন সেদিন ?

বাহ ! কখন !

ন্যাকা !

গলু !

দেখাচ্ছি······

ঐ দুই কিশোরের সামনে গর্ত ছিল। অন্ধকার ছিল। আর গলুর

শরীরে তখন বিদ্যুৎ-স্রোত। সে মুখ-খারাপ করে। ভেড়ুয়া শব্দগু বমনের বেগে, তীব্রতায় সন্থর মুখে নিক্ষেপ করে। এবং একটি হ্যাঁচকা টান, ফলে দুজনই সেই গর্তে, খোদলে গড়িয়ে পড়ে। গলুর দু-চো তখন শাদা ডবল পয়সার চাকচিক্য, থুতনির কাটা দাগে ঝিলিক শ্‌শালা। সন্থর ঠোঁটের কষ নোনতা, সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে উত্তাপ এ যাচ্ছে, উত্তাপে-উত্তাপে শরীর নস্যাৎ করে দিচ্ছে ভয়। প্রতি-আক্রমণ রচিত। আর এত সবে সন্থর মুখ জমাট নীল। কাহিল হতে-হতে হিক্কা এসে গেছে : নন্‌না···। গলু তখন সন্থর কাঁধে বসিয়ে দিয়েছে একটি থাবা, শিরায় বাহিত শক্তি সেখানে প্রবল আকর্ষণ রাখে : ননীর পুতুল

তখন তরঙ্গ-স্রোতে সন্থর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম লড়াইয়ের বিচিত্র স্বাদ। লড়বে এমন সিদ্ধান্ত ছিল না, সবটাই স্বয়ংক্রিয় বলে এখনো কাঁপছে। এখন আর ভীতি নেই, আর কোনো-ও ভীতি নেই তারা গর্ত ছেড়ে উঠে আসে, যেন বা ভয় সেখানে মাটির ডেলার গুঁড়োয় চূর্ণিত। গর্ত। ফলে আনন্দ ও ক্লান্তি। জোরে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে।

কারখানার লম্বা টানা শেডের গায়ে, ন্যাড়া মাঠের বিশাল শূন্যতার ভেতর ওদের থ্যাবড়া ছায়া। দু-জোড়া হাত স-শব্দে ঝেড়ে ফেলছে ধুলো। ঐ-শব্দের প্রতিধ্বনি থাকে।

হঠাৎ-ই গলু প্রসঙ্গ বদলে ফেলল : শুনেছিস।

কী ?

সামনের মাসে কারখানা চালু হবে।

কে বলল ?

কে আবার কানাইদা, ও-ই তো সব ঢোকাবে···এখন থেকে লিস্টি বানাচ্ছে···

লিস্টি ?

হ্যাঁ মাথাপিছু কুড়িটাকা···কুড়িটা টাকা ছাড়লেই লিস্টিতে নাম উঠে যাবে।

কানাইদার কথা মালিক শুনবে কেন ?

মালিকের বাপ শুনবে, ভোটে দাঁড়াবে বুঝলি…কারখানা চালু হলেই শালা ঢুকে যাব…

কেন ?

কেন আবার, কে শালা বসিয়ে খাওয়াবে…

ভালো লাগছে না, ফালতু পাখি মেরে… !

যাহ্‌!

হ্যাঁ।

অন্ধকার এবার সম্পূর্ণ গিলে ফেলে তাদের, শীত-শিশির নেমে আসছে সমগ্র তল্লাট জুড়ে, সতুর কাঁধের ওপর গলুর সেই থাবাটি তখন ক্রমে ঢিলে হচ্ছে…

অ্যা ও দিন যাবে
খ্যাড় দিয়া যে চুল বান্ধে
সে-ও ভাতার পাবে ॥

পশ্চিম-দেয়ালে অন্ধকার বোনা ছিল। আর একটা পুরনো ছবি। ছবিটা দীর্ঘকাল ঝুলছে বলে ঐ ছবি আর দেয়াল একাকার, আবার তা দেয়াল হয়ে যাওয়ায় ছবিটির কথা সবাই বিস্মৃত। পেটের তলায় জমানো তুলো সমেত স্থবির মাকড়শা নিষ্ঠার সঙ্গে ছবিটির পাহারাদারি করে। ক্রমাগত মন্থর বুননে সেখানে সূক্ষ্ম তন্তুজাল। অজস্র রেখা অন্ধকারের অবলম্বন। ফলে ছবির দুটি মুখ কেমন খণ্ড খণ্ড। জালটি ছেঁড়া, সুতো উড়ছে ধুলোও জমেছে। এসবে প্রাচীন গন্ধ, যেন অন্ন তার ট্র্যাঙ্কটি খুলেছে যেন খাটের তলা থেকে টেনে বের করা হচ্ছে কাঁসার বাসন। ফলে মায়া, গভীর মায়া। পুরনো কামিজ সমেত ছবির সেই মানুষ হেঁটে আসছে : যে-মানুষ নিয়া ঘর করছি দিদি···মাঝ-রাত্তিরে ইলশা মাছ নিয়া উপস্থিত···সন্তু তখন প্যাটে···সাতমাস, ঘুমে চক্ষু বুইজা আসতাছে একটা শব্দ করতে পারি নাই···

সবুজ রেলগাড়ির সঙ্গে কত মোহ যে ভেঙে গেছে! এখন ছবির জটিল রেখা, ধুলো, তন্তুজাল সবই সতু অতিক্রম করে যাচ্ছে। তার স্থির চোখ নিক্ষেপ করছে অজস্র শর, শর ছুটে যাচ্ছে ধোঁয়া-ধোঁয়া অতীতে, স্মৃতি বিদ্ধ করছে। সে উদ্ধার করতে পারছে বাবার বিনষ্ট মুখ, অঙ্গ সংস্থান বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়দের স্মৃতি-পীড়িত উচ্চারণ, (এক্কের কালারে বসাইয়া রাখছে জ্যান…) সতু যাচাই করে নিতে চাইছে বলে বিব্রত : সে কি তার বাবার মতো? হুবহু? সতুকে তার বাবার মতো দেখতে এতে সবাই খুশি হয় কেন?

সরি ও সতুর পিতৃদেবের কথা, স্মৃতি ও কাহিনী অন্নর বিচ্ছিন্ন সংলাপে কয়েকবার এসেছে। সেই-সব সংলাপে সময়ের মাত্রা ছিল, ঘটনা পারম্পর্য ছিল মিহি, রেশমি সুতোর গ্রন্থনায়, ঐ সুতোটিই বিরহ। আর ঘটনা-বৈচিত্র্য এক বৈভব। তাতে সুখ, স্পর্শ। তখন সমস্ত দৃশ্য, কল্পনা ঐ স্মৃতির অনুষঙ্গ পেতে থাকে। ধূসর সেই কাচ চোখের সামনে রেখে সে চার পাশ দেখে যাচ্ছে। দিন কতক আগেও চন্নুর মার চৌকাঠের গোড়ায় অন্নর স্থায়ী মূর্তি উবু হয়ে থাকত। চন্নুর মা শব্দ করে পান চিবোতে-চিবোতে পিক কেটে বলত : অত ভাববেন না অন্নদি…মাইয়া কি আপনের জলে পড়ছে…খামকা দোজবরে মাইয়া দেবেন ক্যান…

সেই শররাজি এখন ছবির মুখ থেকে একেকটি বিশেষ লক্ষণ নির্বাচন করে নিচ্ছে : সে কি তার বাবার মতো? এই অন্বেষণের প্রান্তে পৌঁছলে, সাকুল্যে ছবির মেজাজটি ধরতে সক্ষম হয় : অন্ন চেয়ারে সমর্পিতা, বসে আছে, আর চেয়ারের হাতলে বাম উরু রেখে লোকটির ডান পা স্পর্শ করেছে ভূমি, বাঁ হাতের আবেষ্টনে সে যতটা শূন্যতা ধারণ করেছিল সেখানে, সেই অর্ধবৃত্তে, অন্ন প্রোথিত। হাতলে উরু স্থাপন করে লোকটি প্রসন্নতাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

আদতে বাবার আর কোনো ছবি না থাকায়, ভদ্রলোকের স্মৃতিও অনুপস্থিত বলে, ঐ মেজাজটিই সতুর কাছে বাবার একমাত্র ও চূড়ান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থিত। এখন লোকটির এ-হেন মুখ ও শারীরিক আচরণ বেজায় গোলমেলে। কারণ মানুষটি অ্যানার্কিস্ট

ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বীরত্ব-ব্যঞ্জক গল্প ও ত্যাগের বৃত্তান্ত আছে। এমন-কি, সেই-সব স্মৃতি, ঘটনা-বৈচিত্র্যে বন্দুক-স্ফোটনও থাকায় ঐ হাসি অনুচিত। নকশা-তোলা শালটি বেমানান।

ধূলি-ধূসর, মাকড়সার মায়াজাল সমেত ছবিটি অন্ন নামিয়ে এনেছে সে তার আঁচল ছবিটির ওপর প্রলেপের মতো ব্যবহার করছে : তর বাবার টি. বি. হইছিল, কইস না জানি!

এই বাক্যে ছবিটি বিদীর্ণ। অন্ন, মামুলি সেই নারী কাঠ-বোর্ডের ফ্রেমটি ফাটিয়ে চলে এসেছে মাটকোটার গেরস্থালিতে আর ব্রিটিশের খিলাপে পিস্তলধারী ব্যক্তি, অজস্র কিংবদন্তী যার পদতলে, নক্ষত্র লোকের সেই অবিশ্বাস্য মানুষ, যাঁর মাথার পেছনে শাদা গোলাকার জ্যোতি থাকার কথা, তাকে বড় নিষ্প্রভ লাগে। যেন-বা বাস্তবে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে যা-কিছু সংগ্রাম, সবই অন্নর অকাতর পরিশ্রম ও ক্ষিপ্রগতি মাত্র। ঐ লোকটি কুশের পুতুল, অন্নই ঐ-সব গুণাবলী ছবির মানুষটিতে অর্পণ করেছে। না-হলে ঐ-ব্যক্তি নগণ্য। এ-সত্য আরো বিশ্বাস্য ঠেকে যখন অন্ন অতীত গৌরব বলে যায় নিস্পৃহ, অথচ সাবলীল তার সেই বাচনভঙ্গিতে ইতিহাস বড় নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তি অন্নকে ঐ ইতিহাস থেকে চ্যুত করার সমস্ত দক্ষতা করায়ত্ত। এখন সে যেমন সরিকে বলল 'তর বাবার টি. বি. হইছিল কইস না জানি...'। এরপর আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। সেই মহাপুরুষ সতুর চোখে তখন গমিতমহিমা লোকটির জন্যে তার মায়া থাকে। আক্রান্ত ফুসফুসই সত্যের প্রতীক যেন এটুকুই সত্য।

অন্ন সরিকে টেনে নিয়ে গেছে ন্যাড়া পেয়ারাগাছ তলায়। সেখানে হাড়গিলে ছায়ায় রচিত আছে জ্যামিতিক আকার। তাদের শরীরে এখন রোদ, তাদের শরীরে এখন ছায়া। রোদ প্রলম্বিত বলে অন্নর শরীর বিছিয়ে দিয়েছে দীর্ঘ ছায়া : রঙও করছোস একখান, বাবাহ্! আর সে এককুচো সাবান ঘষে যাচ্ছে সরির ঘাড় ও চিবুকে, গলা ও মুখে চক্ষু বন্ধ কর! সরি তখন সেই ক্ষারযুক্ত সাবান-ফেনায় বিসর্জন দিচ্ছে তার দৃষ্টিশক্তি। তার চোখে তখন জ্বালা। সরি আর্ত চীৎকার রাখে

মাইরা ফ্যালাবা নাকি ? অন্ন তখন ক্রমাগত ঘর্ষণে সরির চামড়ার পরত থেকে একটি জ্যোতির্ময় বর্ণ পেতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঐ বর্ণই মঙ্গল, যা দুধে-আলতায়, কাঁচা-হলুদে। সরির আর্ত ধ্বনি অন্নকে বিশেষ বিচলিত করে না। সে তখন বড়ই আহ্লাদিত।

হ, মারুম !

এখানে, সন্তুর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল, সে তড়িৎগতি পায় : কেন ?

সন্তুর এই কথায় প্রতিবাদ ও ক্রোধ ছাপিয়ে অন্য কিছু ছিল, বড় মজবুত ও নির্ভরযোগ্য কিছু। ফলে অন্নর মজা লাগে, চকিতে সে ভেবে ফেলে সন্তুকে কতটা গুরুত্ব দেবে। আর এই ভাবনায় আনন্দ, ও অন্ন তখন ক্রীড়াময় : বেশ করুম, আমি তো তগো শত্তুর ! তার পর মুখের খাঁজে আর গোপন থাকে না হাস্যরেখা এবং সরি ফিরে বসে, 'পিঠটা ডইলা দাও।'

রোদ মরছিল। সরির ঘাড় ও চুলের ভেতর থেকে গোপন মালিন্য অতর্কিতে শূন্যস্পর্শ করে। ঠুনঠুন শব্দে ও তরঙ্গে সন্ধ্যা তখন সন্তুদের মাটকোটার কাদা মাটিতে নেমে এসেছে ধোঁয়া-গন্ধে। সেই ধোঁয়ায়, গন্ধে, মাটিতে, রিকশার হাতলের সিংহ নখ বিঁধে গেল নিঃশব্দে। তার আগে পরে ঘণ্টা-ধ্বনি ছিল। চন্নুর মা চাপা উচ্চারণ করে : অন্নদি ! অন্ন শাদা থান টেনে আনে কপাল পর্যন্ত : আসছে ! ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ গতি তখন চড়াও হয় তাদের ওপর। ভাড়া নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি। সে-সবই দরজার ও-পাশে। একটি কর্কশ-স্বর প্রাধান্য পাচ্ছে। এই বিবাদ অন্নকে সময় দিলেও তার বিরক্তি গোপন থাকে না। যদিও এক সময় পাল্লাটি টেনে তাকে বলতে হয় : আসেন !

সমস্তদিন যে-আহ্লাদে অন্ন পালক-সদৃশ, হাস্যোচ্ছল, তারই ঘণ্টা-ধ্বনি ছিল রিকশাওলার মুঠোয়, তিন আরোহীর অবতরণে। মাথা নীচু করে তারা সন্তুদের চালায় ঢোকে, সন্তুকে ছুটতে হয় মিষ্টির দোকানে। ডবল সন্দেশ একসঙ্গে গালে ফেলে একজন, তার নীল জড়ুল ও জড়ুলের পাতলা লোমে জিজ্ঞাসা : মাইয়া কাম জানে নি ? আমগো আবার ভ্যাশাল সংসার···দুইবেলা বিশখান পাত···পারবো নি ?

শুরুতে অন্ন কুণ্ঠিত, সে প্রত্যক্ষ করছে সরির ঘর্মাক্ত মুখ ও সাংসারিক চাপ। অন্নর গলায় সেই চাপ শুরুতে বিদ্ধ থাকে সূক্ষ্ম কাঁটায়। পরে সে সামলায় এই স্নেহ। কাণ্ডজ্ঞান তাকে মুক্ত করে, উদ্ধার করে, সেই তুলোর স্তূপ থেকে। গড়গড়িয়ে এমন বলে যায় যেন ঐ-সব কথা বহুবার শোনা ও বলায় তা অভ্যাসে নিয়ে এসেছে, যেন পশ্চাদ্‌গামী স্মৃতি বিসর্জনে সে সক্ষম, ঐ স্মৃতি তাকে তিরিশটি বছর পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক লাফে। সেখানে অন্ন নামে এক কিশোরী বিশজন মানুষের ভাতের হাঁড়িটি নামাতে শরীরে জলস্রোত এনে ফেলছে। হাঁড়ির সব ফ্যান তার পায়ের পাতা পুড়িয়ে, ছ্যাঁদা করে, আগুন রক্তে মিশে যাচ্ছে। রক্তে ফ্যান, ফ্যানের গন্ধ। আর্ত ধ্বনি উঠে আসছিল শাড়ি, সায়া, ঝুল অন্ধকার আর তামাকের গন্ধ ঠেলে। সেই ধ্বনি এখন বড়ই সুদূর, সেই ধ্বনির কোনো স্মৃতিও নেই : দ্যাখেন মাইয়া আমার অবাধ্য না··· পুলাপান মানুষ য্যামুন ইচ্ছা গইড়া লইবেন···শিখাইয়া লইলে পারবো না হেন-কাম নাই ··বিধবার সন্তান সুখ-আহ্লাদে তো বড় হয় নাই, পারবো না ক্যান···

তখন জড়ুলটি নড়ে। ডবল সন্দেশ আয়ত্ত করতে বেগ থাকে বলে মৌন। কেবল ঘাড় কাত করায় বোঝা যায় তারা এরকম একটি পাত্রীরই খোঁজ করছিল। সদ্‌বংশজাত, দরিদ্র, পরিশ্রমী ও বাধ্য একটি মেয়ে, যে সহাস্য থাকতে পারবে। অনন্তকাল। পাত্র-পক্ষের সেই মামার চোখ দুটি এ-সব কথা বলে চলে। অন্নকে নিরস্ত করে ইঙ্গিতে, হাতের একটি মুদ্রায় ঐ ইঙ্গিত থাকে। মামা জল খান। সন্দেশচূর্ণ তলিয়ে যাচ্ছে। গ্লাসের খানিকটা জল মাটিতে ঢেলে দিলেন। তাতে সতু আশ্চর্য, 'যাহ্ বাবাহ্।'

অন্ন তখন বিদ্যুৎখেলায় : সরি জলের উপর দিয়া হাঁট···হাঁইটা যা···

মাটিতে সরির পদচিহ্ন।

সরি হেঁটে যায় দু-চার পা, কিন্তু জল শুকিয়ে যাওয়ায় আর কোনো ছাপ থাকে না, সরি থাকে না।

তিনজনের একজন, সম্ভবত পাত্রের মা, সেই পদচিহ্ন দেখে বলে : মনে হয় খড়ম-পাও···

জড়ুলটি স্পষ্ট অস্বীকার করে : নাহ্···কী যে দ্যাখোস···!

এক সপ্তাহের ব্যবধানে তারা ফিরে এসেছে, এবার তাদের সঙ্গে সেই জড়ুলটি নেই, ঐ জড়ুলটি বোধ হয় কেবল পাত্রী-নির্বাচনেই দক্ষ। জড়ুলের পরিবর্তে তারা এবার একটি খর-জিভ এনেছে : লন দেহি একহান রুপার টাহা···। এই নির্দেশ অন্নর প্রতি। অন্ন মাথার ওপর ব্যাণ্ডেজের উপমায় যে থানটি ছিল তা আরো টেনে দেয়। সরির কোনো ভূমিকা নেই। সে তার হালকা শরীর, সাবান-ঘষা খসখসে হাত, মুখ আর কণ্ঠনালীতে দবদব নীল শিরা ইত্যাদি সমেত কোথাও আত্মগোপন করেছে। অন্ন তখন মত্ত। সে খোঁজ-তালাশ চালিয়ে যাচ্ছে, কোথায় রুপোর একটি টাকা পাওয়া যায়। ত্রাতা চন্নুর মা তখন চাপা স্বরে আহ্বান রাখে : অন্নদি। গোল টাকাটায় তেল-সিঁদুর মাখানো হয়। ফরফর করে সতুর অঙ্কখাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ছে অন্ন। আর নিঃশব্দে কাগজে লাফিয়ে পড়ে রাজার কাটা মুণ্ডু তখন খর-জিভে শব্দ নাচে : তাইলে ঐ ১০ই ফাল্গুনই ধাইর্য···

অন্ন শাদা থানটি আরেকটু টেনে দেয়। শরীরে, পানসে এনামেল দাঁতে, সামলাতে পারে না জটিল হাসির আবর্ত। ফলে মাথার ওপর থেকে শ্বেত-ছত্রটি খসে যায়। সাকুল্যে বিবাহের এই উদ্‌যোগ পুনরাবৃত্তি মাত্র, সরি যেন আদতে অন্ন, অন্ন যেন সরি, অন্ন সরি হয়ে যাচ্ছে। তার আচরণে সেই কুণ্ঠা, সংকোচ, লজ্জা ও ভয়। ভয় হয়।

চন্নুদের ঘরে, এক কোণে, সরি তার অস্তিত্ব গোপন করার চেষ্টায় জড় হয়ে ছিল। সেখানে বেরালের লোম, পেচ্ছাপ, ছেঁড়া লেপের তুলো আর কয়েকটা তোরঙ্গ আছে। সে অযৌক্তিক ভয় পেয়েছিল, সরির মুখে জলো ভাব, চোখ দুটো কেবল শাদা জমির বিস্তার, নাসাপুট সূক্ষ্ম খাঁজ সমেত কাঁপছিল।

সরির খোঁজ-তালাশ শুরু হয়। চন্নুর মা তাকে এনে দাঁড় করায়, যা ঠিক দাঁড়ানো নয়, কলাগাছের সাদৃশ্যে সে ক্রমেই নত, আরো নত।

অম্লর খাদ্যনালী থেকে জারিত অম্ল ও অন্ধকার উঠে আসে গুটিকয় শব্দে আশীর্বাদ করেন জ্যান সুখী হয়…

কাগজের ফালিতে সেই পুরনো টাকার রাজকীয় মুণ্ডুর ওপরে মুকুট। সমস্তটাই সিঁদুর-চর্চিত হওয়ায় ঐ মূর্তি বিমূর্ত, তাতে এমন কি দেবত্ব থাকে। পরিবেশ আয়ত্ত করে নিচ্ছে নিদারুণ ধর্মীয় গাম্ভীর্য, অন্ন নতজানু। অন্নকে হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়তে হয় দ্রুত বসার জন্যে, কাগজে খসখস শব্দ, কাগজ থেকে উঠে যাচ্ছে সূক্ষ্ম আঁশ :

ফরিদপুর নিবাসী ··কুলীনকুল সর্বস্ব···কন্যা সুলক্ষণা সরস্বতীর সহিত পাবনা ···কনিষ্ঠ পুত্র বাবাজীবন কালাচাঁদের শুভ পরিণয় ১০ই ফাল্গুন ধার্য হইল··· উভয় পক্ষের মতানুসারে নিম্নোক্ত দ্রব্য দানস্বরূপ কন্যা-পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে ··

নগদ—৫০০৲

সোনা—৩৷৷০ ভরি

বিছানা—১ প্রস্থ

বাসনকোসন—১ প্রস্থ

সরির চোখ তখন পারদ-বিন্দু, গড়াচ্ছে দেয়ালে, থামে ও সেই জটিল ছবিতে।

লালমুখো সাহেবটা বেপাত্তা হয়ে গেছে।

এরকম একটা প্রচার ছিল, মাঝেমাঝেই এরকম প্রচার হত। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধে সেই প্রচার যতটা না রহস্য ধারণ করত তার থেকে অনেক বেশি কৌতুক ও আলস্য ছিল। আদতে সাহেবটি আরো কয়েকজন বাঙালি-গুজরাটি সাহেবের সঙ্গে, বা কখনো একাই কাজের তাগাদায় আসত। ক্যাওড়াপাড়ার নিজস্ব ব্যাধিই এ ধরনের চিন্তার উৎস, যা আবার কোনো চিন্তা নয়। চিন্তার ঊর্ধে এক ধরনের সত্যকথন ; যেমন : এক জেবনে গোরা তো আর কম দেখি নি···সাহেব না ছাই ···দো আঁশলা···। ক্ষেমি সবই জানে, যেহেতু সে অনেককাল যাবৎ এক দীর্ঘ বাঁচা বাঁচছে। সুতরাং ক্ষেমি জানে। ক্ষেমি সাহেবের রঙ বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে তার গায়ের রঙ ও মুখের রঙের ফারাকটা এবং ক্ষেমি আরেকটি সত্য কথা বলবে বলে প্রায় প্রস্তুত।

তখন কোনো কালো মেয়েছেলের গল্প বলে ক্ষেমি, সেই গল্পেও সাহেব থাকে, আর সবই তার চোখে দেখা। সাহেব প্রসঙ্গটি অচিরাৎ কেচ্ছা রস হয়ে যায়, অপোগণ্ড বালকের দলেও সেই রস সংক্রামিত বলে তারা সাহেবের পেছনে তুন্দার ছোটে : টমেটম···টমে···টম···

সাহেবটি সম্প্রতি বেপাত্তা হলেও, জানা-ই যে সে আসবে। টিন, সিমেন্ট, সুরকি, লোহার বিম, শ্রম-লাঘবের গীতে ও ঊর্ধ্বগামী চিমনিতে সেই ইঙ্গিত। আবার সে-সবই সাহেবটির জাঁক বলে গৃহীত। মানুষ যে তার কথা ভুলছে, ভুলতে চাইছে, এর মধ্যে আছে ঐ চিমনি ও জ্যামিতিক আকারে আবদ্ধ কয়েকটি পাইপ, ট্যাঙ্ক ও নানাবিধ যন্ত্র। যন্ত্র-জাল। এই স্থাপত্যের প্রবেশপথ উজ্জ্বল করেছে চড়া রঙে লেখা সাইনবোর্ডটি : নিউ ইণ্ডিয়া টুলস। হয়ত কোম্পানি কিংবা ফ্যাক্টরি এই নামটি স্বাধীন এক অস্তিত্ব বলেও সাহেব গৌণ।

লাইনের ধারে বিস্তৃত সেই ভূখণ্ডে, যেখানে এখন নিউ ইণ্ডিয়া, সেখানে কাচজল ও জলপোকা ছিল। মগ্ন হাঁস ক্ষুৎকাতর চঞ্চু পিঠের পালকে গুঁজে ঝিমত, ভাসত, সেখানে এক-ঠেঙে বক ছিল। নিরবধি জলে তরঙ্গ ছিল বৃত্তে, বৃত্তের আকারে ; আর ছিল ইতস্তত অন্ধকারের অবয়ব, মাটিতে, জলে ও মাটির ওপরে। ঐ অন্ধকার আদতে জলে স্থলে সবুজ হয়ে থাকত, সবুজ পচত, পচে অন্ধকার হত। হাড়ের কাঠামো নিয়ে মানুষের ছুট-কাজ ও চলাফেরা ছিল সশব্দ, নিঃশব্দ। সেখানে, সেই ফাঁদ ও গহ্বরে, ফি সন সর্পদংশন।

নির্বিকার, পরিত্যক্ত জলায় মৌন প্রতিমা, কোমরের ঘুনসিতে ঝাঁকি মেরে হারমাদ বালকের দল ঝপাং শব্দে তা বিসর্জন দিত। কখনো-কখনো হাতের বিস্তারে তাদের আলিঙ্গন করতে হয়েছে মৃত্যু, পাঁকের শৈত্যে খুঁজে নিতে হয়েছে মৃত্যু। চ্যাপ্টা নাক ও মুখ তখন পাঁকের উৎস।

অথচ সম্পদ ছিল, দিগন্ত ব্যাপী। সবুজ বর্ণটি মোহময়, বড় ঐশ্বর্য আছে জলে। ওল, কচু, খারকোল, হেলেঞ্চা ও কলমি। জলে চুনোমাছ, কাঁকড়া। আর তার বিপরীতে তীব্র শাদা রঙে ও সেই আদিম লতাগুল্মে,

ঘোর কৃষ্ণবর্ণে, চিরায়ত অমাবস্যা। এ সবই অভ্যাসে, অস্তিত্বে একাকার বলে, কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না। চন্নু কিংবা রণ, কিংবা গলুর সঙ্গে প্রিয় নিরিবিলি পেয়ে যেত সত্নু। এই সৌন্দর্যে তারা ওতপ্রোত দেখেছিল দূরের সিগন্যাল, যাতে চড়া রঙ বদলে যেত মুহুর্মুহু ; আবার সিগন্যাল যেহেতু স্পষ্ট করে সবুজ মেল, অতএব ব্যক্তিগত দুঃখ স্মৃতি, এ সবও ছিল। সত্নুর মনে পড়ে সেই অভিজ্ঞতা, অন্নর নির্দয় প্রহার। বাবা জীবিত নেই এই তথ্যটুকু জানায় কতক্ষণ তাকে মৌন থাকতে হয়েছে। ঐ দিনটিই অচিরাৎ কেমন বদলেছে, ওজন দিয়েছে তাকে। সে তো ক্ষেমির মুখে শুনেছে বৃষ্টিপাত, বর্ষগণনা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের, পৃথিবীর জন্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত। তাবৎ পৃথিবী পৌরাণিক হয়ে উঠেছে, মেঘ-সঞ্চারে অদৃশ্য যোদ্ধা ও গোপন শরের সন্ধান করেছে সে। অন্ন ও চন্নুর মার ব্যাখ্যায় সেই পৌরাণিকতা একটি ছেদ রাখে। তারা বর্তমানকে ঐ পৌরাণিকতা থেকে রেহাই দেওয়ার পক্ষপাতী। বিশ্বাস করে 'কলিযুগ' খণ্ডিত, অস্থায়ী এক সময়, যা ধ্বংসে বিলীন হলে কাল-চক্রটি পুনরায় আদি থেকে যাত্রা শুরু করবে। রণ কিংবা গলুর সঙ্গে এ-সব ছায়া-ছায়া কথার কোনো লেনদেন হয় না। এ-টুকু সে সঞ্চয় করে রাখে সরির জন্যে। তুলো-ওড়া ছিন্ন লেপে, অনিয়ন্ত্রিত ঢিলে শরীর-দুটি এলো হয়ে থাকে। সরির দু একটা আঙুল ছাড়া থাকে সত্নুর মাথায়, চুলে।

দিদি!

কী।

মানুষও আগে বানর ছিল?

হুঁ।

কী করে মানুষ হল?

আস্তে, আস্তে, বদলে যেতে লাগল।

কী করে?

বা, পৃথিবীও তো বদলাচ্ছিল।

তা-ই?

হ্যাঁ।

পৃথিবী কি আরোও বদলাবে…

তা তো জানি না…বদলাতে পারে।

মানুষও তা হলে আরোও বদলাবে ?

বদলাতে পারে…

মানুষ তখন কী হবে ?

জানি না।

কেউ জানে না ?

জানা যায় না, হাজার হাজার বছরের ব্যাপার।

কিছুই জানা যায় না, নাহ্ ?

জানিনা।

কেন ?

বললাম তো হাজার বছরের কথা কে জানবে…

কেন জানে না !

সতু, দেখ, এত কথা জানি না, কানাইদারে জিগাইস।

কানাইদা ঘোড়ার ডিম জানে !

তা হলে ভগবান জানে !

ভগবান-টগবান বাজে।

কে বলল ?

কে আবার বলবে. আমি জানি।

তুই তো দেখি সবই জানিস !

জানিই তো, কদিন বাদেই তোর বিয়ে হয়ে যাবে, আমি পাশ করে চাকরি করব, মা আরো বুড়ো হবে, তোর ছেলে হবে, চন্নুর মার মতো ঝগড়া করবি তুই, একদিন মা মরে যাবে আর তখন আমি পালাব…

সতুর বাক্যস্রোত অব্যাহত থেকে যেত, এ-বিষয়ে সে এত জানত যে অনর্গল কথা বলে সে-সব মূর্ত করে দিতে পারত, এমন-কি তাতে খুঁটিনাটিও বাদ যেত না।

কিন্তু সরি হঠাৎ-ই তাকে টেনে নেয় ঘনিষ্ঠ, পিঠে কিল মেরে বলে ওঠে 'পাগল'। সেই ধ্বনিতে কৃত্রিম বেদনা মিশিয়ে সতু 'আহ্' করে ওঠে।

এবং পূর্ণ কলস যেন উল্টে যায় তখনই, সরি আর সন্থ খলখল হাসছে তো হাসছেই।

ক্ষেমির ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল : ও সাহেব বাঁচবে নি, নির্যস ভেদবমি হবে!

এই ক্রোধ ঠিক বোঝা যেত না। সমগ্র ক্যাওড়াপাড়ার এতে কোনো সমর্থন নেই। ক্ষেমির আচরণ ভিমরতি মাত্র। আর তারা একত্রে, যৌথ এক স্বপ্নেও ফিরে যাচ্ছে ক্ষেমির বিপরীতে, যেহেতু সেখানে রুটি ও রুজির আশ্বাস। অথচ ক্ষেমির ঐ বচন, বচনের তাৎপর্য নিয়ে যেন-বা পুনরায় জেগে উঠবে দীর্ঘ ও গভীর এক জলা। ভগ্নাংশে রচিত আদিম লতা ও গুল্ম, সেখানে পচা পাঁকের গন্ধ বুকে নিয়ে উলঙ্গ ও কালো শিশু ফিরে আসবে অশত্থের জটাজুট সরিয়ে, কোথাও দুপুর ঘাই মারবে পচা জলের ভেতর থেকে। এখন পাঁকের ভেতর রোহিত বর্ণ সেই মাছের খোঁজে ফাটা হ্যারিকেন অন্ধকারে জ্বলে। ভট্ ভট্ শব্দে পাম্প চলে। পাশে ছেঁড়া মাদুরে রাতভর শুয়ে থাকে তাড়ি খাওয়া মানুষ। ক্যাওড়াপাড়ার সতের বছরের মা পাঁচবাড়ির কাজ সেরে এসে সন্তানকে শাপান্ত করত, সেই মা ও শিশুটির কী হবে? তারা কী করে অতিক্রম করে, এড়ায়, সেই জলোটান?

এই জলে কলহ ও শৈত্য। ক্ষেমির বর্ণনায় আবার এই সব ছায়া, অন্ধকার ও সবুজে সৌন্দর্য থাকে। নত বাঁশঝাড় ও সাঁকোয়। এই জলা সেই রূপকথার বৃত্তান্তের মতো, কেননা এখানে পানকৌড়িও আসে! আর কে না জানে পানকৌড়ির ডুব ও অতল জলের সেই কৌটোর কথা, যেখানে আত্মার নিবাস! ফলে যা-কিছু দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় সমস্তই ভর করে অপোগণ্ড শিশুদের ওপর। রণ, গলু ও সন্থরা তাদের মাথায় চাটি মেরে বলে : ধুস!

গলুর দাদাকে ফের বসিয়ে দিয়েছে, মাঝে-মাঝেই বসিয়ে দেয়। এক হপ্তা, দেড় হপ্তা। তখন ক্ষেমির ঘুঁটে-বেচা, ডিম-বেচা দু চার পয়সার সঞ্চয় থেকে চলে, তারও পরে কয়েকদিন ভাত রান্না হয় না। ফলে নিউ ইণ্ডিয়া টুলস শুধু গলু নয়, গলুর দাদাকেও টানছে, কারণ গুজব এই যে

বেশ কিছু স্থায়ী লোক নেওয়া হবে। পাঁচ-ছ বছর কারখানায় কাজ করে শ্যাম অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, দু-একখানা চটি বইও আছে, সে মধ্যে-মধ্যে পড়ে। কখনো-কখনো ঐ চটি বইয়ের ছাপানো অক্ষরগুলো হুবহু গলু, রণ ও সন্তুকে শুনিয়েছে। বক্তৃতার আদলে সেইসব কথা উচ্চরণ করে শ্যাম বেজায় সুখ পেত, তাকে বড় খুশি দেখাত। তবে শ্যাম কথাগুলো একটানা বলতে পারত না, কথা বলার ভঙ্গিটিই তার প্রিয়, অন্য দিকে শব্দচয়ন ও বাক্য নির্মাণে সে ঐ সব চটি বই ও ক্যাওড়াপাড়ার মিলন ঘটাত।

মালিক শালা হারামির গাছ!

হুঁ।

বুঝলি।

হুঁ।

শোষক, ওয়ার্কারদের শুষে নিচ্ছে··

হুঁ।

ওয়ার্কারও ঘাস খায় না···বুঝলি···

হুঁ।

কী বুঝলি!

এই জিজ্ঞাসা বড় নিরাসক্ত, তাতে কোনো তীক্ষ্ণ ফলক নেই। ফলে তা সন্তুকে বিদ্ধ করে না। বাধ্য করে না জবাব দিতে। সন্তুর তেমন কিছু করণীয় নেই চুপচাপ শুনে যাওয়া ও বোঝার ভান করে যাওয়া ছাড়া। আবার এই সত্যটি ধরে রাখতে তার একটি নির্দিষ্ট আচরণ থাকে। ঝাঁকড়া মাথা ঝুঁকিয়ে, দাঁতে নখ কাটতে-কাটতে সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয় শ্যামের প্রতি। আচরণটি ক্রমে গড়ে উঠেছে, এখন তা স্বয়ংক্রিয়। শ্যাম এই শ্রদ্ধাটুকু গ্রহণ করে থাকে। আর সত্যিই তো সন্তুর আচরণ তেমন কপট কিছু নয়। শ্যামকে সে গলুর দাদা বলে সমীহ করে না। শ্যাম অনেক কিছু জানে, কী করে যে জানে! তীব্র সুর সৃষ্টি করে মাঝরাতে, চাঁদনিতে। কী করে! শ্যামে রহস্য আছে, আনন্দ আছে, এই-সবই সন্তুর সমীহ ও শ্রদ্ধার উৎস!

এখন শ্যামের কথা বলার ঐ মুদ্রাদোষটি 'কী বুঝলি' যদিও গৌণ, তবু সে অজান্তেই প্রতিবার বলেছে, 'হুঁ'। শ্যামের কেতাবি কথার কতটুকুই-বা সে বোঝে, তদুপরি 'শোষক'। সে তো কখনও শোষক দেখে নি। শোষকের সঙ্গে 'শুশুক'-এর কি কোনো সম্পর্ক আছে! সে জানে না। ধনী-দরিদ্র বোঝে। দারিদ্র বোঝে! তথাপি সত্তু যে প্রতিবার অন্যমনস্ক 'হুঁ' নিক্ষেপ করছে তার কী অর্থ! তা কি বুড়োমি নয়, মিথ্যে নয়, যাতে সে সামলে নিচ্ছে অতিপ্রিয় 'কেন' এই সরল সত্যটি 'কেন' এই শব্দটিতে যে রোমাঞ্চ, আলোড়ন ও খননকার্য আছে সে কি ক্রমে সেখান থেকে সরে আসছে? বদলে নিচ্ছে ঐ হ্রস্ব নিরর্থক 'হুঁ' ধ্বনিটির সঙ্গে।

অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির নোনা ইট বেয়ে তীব্র অ্যাসিড-জল বেরিয়ে আসে। দেয়ালটি অংশত শাদা হয়ে গেছে, সেখানে আর শ্যাওলা-অন্ধকার নেই। যে-অন্ধকার জমে ছিল সুলতান আলম স্ট্রিটের ভেজা গলিতে, গলি সংলগ্ন মাঠ ও জলায়। পচা সবুজে বেগুনি ফুলের বাহার ফুটে থাকা, আ-দিগন্ত সেই কচুরিপানায় আন্দোলিত মোষের লেজ, ছুট আলস্য নিকটের সাঁকোয় দীর্ঘ ছায়া ভাঙছে। তখন সিগন্যাল বদলে যাচ্ছে বলে সমগ্র তল্লাট কেঁপে উঠছে ভিত্তিভূমি সমেত। ঐ কম্পন স্রোত হয়ে যায়। ট্রেনটি হুইসিল দেয় না, চলে যায়। কম্পন স্রোতও বিলীন, ফিরে আসছে নিষ্কম্প স্থবিরতা। লাইনের ঢাল বেয়েই তা গড়াচ্ছে। তাতে নিদ্রাস্পর্শ। কোথাও সামান্য পাখসাট।

খাড়া, স্থির এই অঞ্চলে টালমাটাল সাঁকো স্বীকৃতি জানায় কারখানা বিষয়ে অন্তিম গুজবটিকে : কাল থেগে লোগ লেবে। প্রতিবার এই সংবাদ পরে গুজব বলে প্রমাণিত হয়েছে, অযথা চাঞ্চল্য এনেছে কৌতূহল ও শংকা বেমক্কা ঘায়েল করেছে। নিতাই-ক্যাওড়া ভোলার দোকান থেকে বন্ধক দেওয়া থালাটা ছাড়িয়ে নেবে এরকম কল্পনা ছিল। লালপেড়ে ডুরে শাড়িও তাদের প্ররোচিত করেছে কারখানা সম্পর্কে আশা বজায় রাখতে। বা ঐ চিমনিটিই স্বয়ং প্ররোচিত করেছে ভাবতে যে সে আছে, কিছু একটা হবে। আর এত কৌতুহল ও শংকার নির্যাতনে, প্রহারে, এক সময় তারা ভাবনারহিত বড়ই স্থাণু। তখন হাতে

লণ্ঠন ঝুলিয়ে সেই গুজব রূপান্তরিত হল নিছক সংবাদে। গুজবটি সংবাদের মাহাত্ম্য পায় শেষে।

পরপর কয়েকটি ট্রাক আসে, তাতে ধুলোর শরীর ভেসে ওঠে, সুলতান আলম স্ট্রিট ধুলোর শরীর হয়ে গেছে। মেঠো রাস্তার কয়েক হাত ওপরে ধুলোর ঐ অবয়ব কিছুক্ষণ ভাসে, তাতে মন্থর গতি থাকে, ট্রাকের শব্দ থাকে আর এ-সবের অনুষঙ্গে গলু ফের বলে ওঠে : লোগে যাব এবার! এই উচ্চারণে যে-স্বস্তি ছিল, চিমনি, শেড, পাঁচিল ও গুদাম সমেত তা এক ভাস্কর্য।

এখন পিঙ্গল ধোঁয়ার প্রতীক্ষা!

দীর্ঘকাল পরে সরিব বিয়েকে কেন্দ্র করে জ্যাঠামণি বৃত্তান্তটি আবার এসে যায়। এবারের সমগ্র বর্ণনাটি অন্নর। সত্থ সঙ্গে গিয়েছিল ঠিকই, জেঠুর ঘোষণাটিও তার স্মরণে আছে। সেই ঘষা স্মৃতি থেকে সে পবিত্রাণ পায় অন্যত্র তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়। এখন অন্ন সেই বৃত্তান্ত, সরিকে জানাচ্ছে, আর সত্থ ফিরে পাচ্ছে সেই স্থির মুহূর্ত। জ্যাঠামণির মুখমণ্ডল এখন ছেনির ঘায়ে গড়ে উঠতে থাকে যাবতীয় ভাব, ব্যক্তিত্ব ও কুঞ্চন সমেত : শরীরের অনুপাতে, গোল মাথাটি বেশ ছোট, নিখুঁত ভুরুর তিন আঙুল ওপরে এসে সেই গোলাকার কালো বর্ণটি থেমেছে। ভুরু-সন্ধি থেকে গভীর রেখাটি সামান্য নেমে গেছে দু-পাশের ভিত্তিভূমিতে। নাসাছিদ্র দুটি প্রকট। শক্তিশালী কুচি দাঁত গোপন থেকে গেছে গালের ভেতর, বাইরে সূক্ষ্ম একটা রেখা। রেখাটি এঁকেবেঁকে যাচ্ছে : হাসি, অনুকম্পা। ওপরে বা নীচে কোনো স্ফীতি না থাকায় জেঠুর যাবতীয় গাম্ভীর্যের সহায়ক ঐ রেখাটি। রেখাটি বিদ্যুৎ-গতিসম্পন্ন : তা কে তোমাকে বারোমাস দেখবে মেজোবউ, আমার তো কুবেরের ভাণ্ডার নেই, আর কাঁহাতক আমি টানবো···একটু চেষ্টা করো, ছেলেটাকে এবার লাগিয়ে দাও কোথাও···সরির বিয়ের জন্যে একটু পাড়ার লোকদেরও তো বলতে পার। তুমি বিধবা-মানুষ কী করে সামলাবে না হলে···দেখ। এইসব কথা ও বেঁচেবর্তে থাকার উপদেশ সমূহের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে, অন্ন গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে কথাগুলো।

দুপুর ছড়িয়ে ছিল চার পাশে, বাতাসে ধুলো ও দুপুর, দুপুরের মুন গন্ধ। আর এই ক্ষত নিরাময়যোগ্য নয় এই ক্ষত অনেক অন্যত্র আঘাত ও ব্যাধি জাগাচ্ছে। নেশা, বিকার। কবে যেন জেঠুই বলেছিল আরেকটি আঁকাড়া সত্য, সেই সত্য আদতে নিন্দা, কলঙ্ক। অন্ন এখন বিকারের ঘোরে চলে যাচ্ছে। সে সরিকে সমস্তই বলে যেতে থাকে এই ঘটনাস্রোত, পারিবারিক কালপঞ্জীতে কত ঘেন্না, কুৎসা ও তুচ্ছতা অন্ন এখন সংকটের শীর্ষে, অকপট এই মুহূর্তে সে সরি ও সন্তুর জন্যে কোনো পশ্চাদ্‌ভূমি রাখে না। সরি ও সন্তুর স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সমগ্র পারিবারিকতা, পিতৃ-পরিচয়।

তরা ভাইস্যা আইছস···

তগো তিনকুলে কেউ নাই···

ভালো নাই···

মন্দ···নাই······নাই···

নিঃসঙ্গ সেই নাস্তির শাসনে, শৃঙ্খলে, সন্তুর অন্নকে বড় ঋজু, ক্ষাত্র মনে হয়। তারা, সে ও সরি, শুধু এই নারীকেই শনাক্ত করতে পারে তাদের উৎস ও আশ্রয় হিসেবে। হঠাৎ-ই অন্ন বলে ফেলে : কি লো সন্তু বুইনের বিয়া দিতে পার্বি না!

কোনো জিজ্ঞাসা নয়, বিস্ময় নয়, প্রত্যাশাও না-থাকায় এই কথা কেবলই শব্দলহরী, ধ্বনি রেখা, শূন্যে ক্বচিৎ কম্পনই তার পরমায়ু ও তাৎপর্য। তথাপি অমোঘ এই বাক্য অন্নর তীব্র ও একাগ্র দৃষ্টির সংস্পর্শে বড় কর্কশ। তাতে এমন-কি আত্ম-হনন ও আছে। একসঙ্গে তিনটি প্রাণীর এই জাদুকরী বাঁচাতেই যেন কিছু একটা ছিল যা বধ্য বা এই তিনজন-ই পৌঁছে যেত এমন হত্যাকারী আবহাওয়ায়, কালে যেখানে ছুরিকাবিদ্ধ সময় পড়ে আছে।

অন্নর কণ্ঠস্বর তখন আবেগবর্জিত কটা-চোখে কোনও উজ্জ্বলতা নেই। তার মুখ তখন পাথুরে। বৈচিত্র্যহীন, কাঠ-গলায় সে আত্মহননের তথ্য ও কাহিনী বলে যাচ্ছে। কলকাতায় কবে, কখন দরিদ্র মানুষ আত্ম-হত্যা করেছে—অন্ন জানে। এত-সব তথ্যে প্রকাশ যে অন্ন আদমশুমারির

নিষ্ঠায় হুবহু সে-সব মনে রেখেছে, এই মনে রাখার এক দায়িত্ব ছিল তার। অন্ন সেই দায়িত্বে অটল।

বর্ণনায় জানা যাচ্ছে মৃত ও অর্ধমৃত, মৃত্যুর-প্রতীক্ষায়-থাকা সেই-সব মানুষ বড় দলবদ্ধ, বড় সংগঠিত। মৃত্যুর, হত্যার কারণ ও প্রকারে সেই-সব লক্ষণাদি আছে যাতে তারা এই চিহ্নটুকু রাখে যে তারা একলা নিজের জন্যে মরে নি। একটি পরিবার একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে কোথাও-বা পরিবারের একজন-ই হত্যাকারী। বঁটি জাতীয় অস্ত্রে সবাইকে মেরে ফেলে, নিজের গলায় কোপ বসিয়েছে সে। রক্তপাতে, আকস্মিক, অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠলেই সন্তুর কেন যেন ব্রিটিশের কথা মনে পড়ে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন কোথাও অশ্বখুরে ভাঙতে থাকে ধুলোর প্রাসাদ। উলঙ্গ অস্ত্রের ধাতব চাকচিক্য ও রেখাই তখন আলোর উপমা। আর গতিময় অশ্বের উরুতে তীব্র যে কম্পন সেখানে সে নিজেকে, কাউকে দেখে।

অন্নর অভ্যাসে. বিশ্বাসে, যা কিছু ব্যক্তিগত সবই এভাবে ফুটপাথ, দেশ ও গ্রামের প্রসঙ্গ পেতে চায়, ফলে সে মুক্তি পায় অন্ধকূপ থেকে। যেখানে যত অবসর, স্থিতি ও শ্রম আছে সবই তার করায়ত্ত। ফলে সেই ভ্রমর-মেঘ দংশনহীন। তা কেবলই গুঞ্জন, অচিরাৎ বর্ষণ উন্মোচিত করে দিচ্ছে অমলিন শাদা দিগন্ত। বাঁচার কৌতুকে অন্ন তখন পূর্ব-উচ্চারিত বাক্যটিকে ফালা ফালা করে, ফলে সেই মৌল নাস্তি এখন সহাস্য : ক! কী রে সন্তু! ক, দেখি! আনন্দস্রোত তখন।

বাঁ দিকের মাড়িতে দু-একটি দাঁত না-থাকায় সহাস্য অন্ন মুখবিবরে যেটুকু অন্ধকার স্থায়ী রেখে দেয়, তা বড়ই নির্ভেজাল, নিপুণ সেই লীলায় সে গতিময়, সস্নেহ: ক! সে সন্তুকে কাছে টানছে ঐ শব্দে এবং ধবল বাহুর আলোড়নে। যেন-বা সে অতিক্রম করে যাবে শূন্যতা, কালো জলস্রোত। অন্নর বাহু বৈঠা হয়ে যাচ্ছে। 'সাঁতার দিয়া আমি আর ননদ-ঝি মেলা শাপলা তুইলা আনতাম', সন্তু এই কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মৌন অন্ন এখন ক্রমে ভুলে যাচ্ছে যাবতীয় শোক, শোক-গাথা। অন্ন তখন অমর, বড় প্রাচীন এক জীবন আছে অন্নে,

চুলরাশিতে কয়েক গাছা শাদা সুতো তারই সাক্ষ্য-প্রমাণ। ঐ শাদা চুল উড়ছে পতাকা। শাদা এই বর্ণ তুলকালাম যুদ্ধে অশ্ব-হ্রেষা ও তীব্র গতি স্তব্ধ করে, অশ্বটি সামনের দু-পা তুলে দেয়, তখন শাদা ফেনা ও বুদবুদ, প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথ, পলাশীতে স্তব্ধতা, জয়-পরাজয়, মৃতের শরীরে টেনে দেওয়া হচ্ছে শাদা থান, জয়-পরাজয় ও সন্ধিতে ঐ শাদা রঙটি বহুবার মহিমান্বিত। অন্য দিকে মানুষের তাবৎ অভিজ্ঞতা ও কল্পনায়, যেখানে যত সরল শুদ্ধতা, নিমেষে তা স্মরণ করায় এই বর্ণ। বর্ণটি স্বয়ং প্রতীক, কোনো বাহ্য অস্তিত্ব নেই। অন্ন প্রকট শাদা, তার থান, ধবল শরীররেখা ও ত্বক, ঊর্ধ্বে ঐ শাদা চুল।

সতু অন্নকে হারাতে থাকে, অন্ন যেন নেই, অন্ন যে আছে তা মায়া, ভ্রম। যত সে দুর্লঙ্ঘ্য টানে অন্নর শরীরের গন্ধ পেতে থাকে ততোই সে টের পায় অন্ন মরে গেছে, মরে যাচ্ছে।

তুমি খেয়েছ ?

অ···হ···।

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেল্যা দিছেন কেশ
তাই দেখ্যা সূর্য-ঠাকুর ফিরেন নানান দ্যাশ ॥

কয়েকদিন যাবৎ অন্নর রাতে জ্বর হচ্ছে, ওপরের ভারি ঠোঁটে জ্বর-ঠোসা হচ্ছে। ছেলেবেলায় শোনা, সারা জীবনের আতুর-বিশ্বাস সমেত সে সুবজাইর ব্রত বলে চলে ঠোঁটে হাত বুলিয়ে : হত্যের বিনাশ নাই···সূয উইল হত্যা···দশ দিক আলো কইরা রাখছে···ছুটোকালে কত বরতো পালছি···। তখন পেতলের ছোট্ট ঘড়াটি আমসরা ও স্বস্তিকা চিহ্ন সমেত রণর মার মাথার ওপর, তাতে ঐ নারী বড় গম্ভীর। যেন ভর হয়েছে। মা শেতলার ভর, ক্যাওড়াপট্টিতে নিতাই সর্দারের মাগটার যেমন হয় ফি-হপ্তায়, শনি মঙ্গল বার। নিতাই সর্দারের মাগ তখন দেবতা, সবাইকে তুই-তোকারি করে, টাকা ও ফল পায়, সে নাকি নেশা-ভাঙও করে। আর রণর মা কেবল ভয় পায়, আতঙ্ক, যখন রণর ঠাকমা সংকটার কাহিনী বলে।

কী চাস ?

না—শান্তি, অক্ষয় সিঁদুর, বালাই-বিপদ দূর, সন্তানের স্বাস্থ্য···

কী চাস ?

না—পড়শির মরা গাছ ফলন্ত হোক, গোরুর বাঁটে দুধ আসুক বটের আঠা···ইলিশের পেটে ডিম···সতীনের ছেলে···মেঘে জল··· খেতে ফসল···

উপবাসে, ধর্মভাবে ও পার্থিব কামনায় তারা ফিরে যাচ্ছে নিজস্ব গোমে, দুটি বলদ যেখানে এঁকেবেঁকে হাল টেনে যায়, কুলো শূন্যে তুলে দু-হাতে আলগোছ টোকা মেরেছিল তারা, ভরা পুকুরে সোনার নথ ও

শ্যাওলা সমেত ঘাই মেরেছিল পুরাতন মৎস্য, মুখের কাছে হাত নিয়ে কেউ প্রিয়জনকে আহ্বান করেছে দিগন্তব্যাপী : আ···কা···ই···লা···

আর এখন হারান ক্যাওড়ার হাঁদাগোবা বউটা মেছো-চোখের ওপর থেকে রুখু চুল সরিয়ে ছেলেটাকে লাল ডবল পয়সা দিয়ে বলে : যাহ, চিটগুড় খেগে যা। আজগের বেলায় রান্না হবে। তখন উল্লাস, তখন আহ্লাদ। সমগ্র তল্লাট জুড়ে তথাপি যে ধুলো ও শুষ্কতা সে-সবই অলৌকিক বদলে যাবে। মঙ্গল-শিশির পতনের শব্দ শুনবে তারা।

এরকমই একটা ধর্মীয় দিন। এক হাঁড়ি ভাত কুকুরকে ধরে দিয়েছে চন্নুর মা। যে-মানুষটার অস্তিত্ব মাটকোটায় কদাচিৎ টের পাওয়া যায়, উপার্জনে অক্ষম সেই চন্নুর বাবা, কাকামণি এতে বিরক্ত, 'মানুষ এক-মুঠো ভাত পায় না আর···'। চন্নুর মা গর্জে উঠেছিল, যুক্তিও থাকে। কারণ প্রকৃতই চন্নুর বাবা যে সেই-সব অভুক্ত মানুষের জন্যে উদ্বিগ্ন এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। বরং গ্রহণের খাদ্য যে অমঙ্গল, তা সমগ্র জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, ঐ মানুষটির ভবিতব্য তখন উচ্ছিষ্টভোগী, অন্ধ পরিব্রাজক, অমঙ্গল তার কপালে স্থায়ী ও গভীর রেখা এনে দেবে। তৃষ্ণার্থে সে সমুদ্রে গেলে জলরাশি বাষ্পীভূত, শ্যামলভূমি শুষ্ক প্রান্তরে পরিণত হবে, প্রিয়জনের অকাল-বিয়োগ, সেই ব্যক্তি মহাপাতক, কালকর্ণী, আগুন তাকে দাহ করবে না, জল তাকে ভাসাবে না, তার এমন-কি মৃত্যুও হবে না, সে অনন্ত অশুভ। এত-সব কথার পরেও ভুলা-মানুষ চন্নুর মা পা ছড়িয়ে পান সাজছিল : খ্যান্ অন্নদি !

না গো বুইন, এই সময় কুটা-গাছও মুখে দিতে নাই···

চন্নুর মা সাজা পানটি ফেলে দেয় ও অন্নর দিকে নিষ্পলক তাকায়, তাতে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। যেন-বা সে জানতে চায় অন্নদি আপনার তা হলে এ-অবস্থা কেন, আপনি তো পাপ, অনাচার কিছুই করেন নি, আপনার এত হেনস্থা কেন। চন্নুর মাকে অবিশ্বাস স্পর্শ করে : কত তো পাললেন !

হ, নাইলে কপালে আরো কী ছিল কে জানে !

তখন নীল শূন্যে ছিল শিকারী পাখির আলোকিত ডানা। ধাতব

ঔজ্জ্বল্য। ছিন্ন সেই ডানা ক্রমে গ্রাস করতে থাকে কঠিন ধোঁয়ার আস্তর তাতে পূর্ণগ্রহণ। আর তখন দীনতুনিয়ায়, জলায়, মাঠে, মাটকোটায় নির্ভেজাল অন্ধকার। অন্ধকার তারই ছায়া, সেই ছায়ায় গলুর দাদা খোঁজ করে যায়: সতু পিসি এসেছে নাকি রে!

কই না; কেন রে শ্যাম।

কোথায় যে গেল?

চ্যান করতে যায় নি তো?

বলে যাবে তো!

চনুর মা ফিরে আসে, তারা ক্ষেমি সম্পর্কে তু চার কথা বলে, যেমন মানুষটা ন্যায় অন্যায় বোঝে, অনেক কিছু দেখেছে, শরীরে মায়া টান আছে, মুখের গ্রাস সে তুলে দিতে পারে অভুক্তকে। এই এক প্রসঙ্গ গ্রহণ মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে তামাম তল্লাটে চারিয়ে যেতে থাকে, তারা বড়ই নরম তখন, স্মৃতির আনন্দ প্রহার থাকে ক্যাওড়াপট্টিতে।

আর বলিস নে সেই তুর্ভিক্ষের টেইমে···

পিসি লাল মুলোকে কেন দেখতে পারে না বল দিকি।

গেল মাঘে চার কুড়ি পাঁচ বছর হল··

গলুদের দাওয়ায় বৃত্তাকারে তারা বসেছে, উদ্বেগ ও শংকার তাড়না টেনে আনছে নানান বৃত্তান্ত, এইসব ঘটনা ও কালপঞ্জীতে ঐ নিরুদ্দিষ্ট মানবীর জীবন কাহিনী রচনা করে চলে তারা, যাতে তার জীবনের প্রাচীনত্ব সংশয়াতীত তারা সিদ্ধান্ত করতে পারে ক্ষেমি এক এবং একক, ক্ষেমির পরে আর কেউ নেই, কিছু নেই।

ক্যাওড়াপট্টি ডবল বাঁশের সাঁকো পানাপুকুরের গাঢ় সবুজ (এখন কালো) এক খাবলা রঙের ওপর দিয়ে গলুদের মেটে-ঘর অবধি খোঁচার মতো চলে গেছে, ঐ সাঁকো যেন-বা বিদ্ধ করেছে ঘরটিকে। যেন-বা, এই জনসমষ্টির প্রাচীনা মানুষের তাবৎ গুরুত্ব স্পষ্ট হচ্ছে সাঁকোটির এই অবস্থানে। গলুদের ঘরের কাছে এসে ঐ ডবল বাঁশ তুটো নিয়ত পায়ের চাপে ফেটেছে, তাতে চোঁচ শতমুখী, ফলে এই যে বাঁশ তুটি ক্রমঃ বিলীন তা-ও এক প্রশস্তি। সন্ধ্যা গাঢ়তর বলে এখন অন্ধকারের বুদবুদ, লম্প ও

হ্যারিকেন জ্বলছে ক্যাওড়াপট্টিতে, বিচ্ছিন্ন সেই-সব আলোকবিন্দুতে অন্ধকার তরল হয়। যেন-বা বনজ, চান্দ্র-রৌপ্য, উড়বে ধনুকরের নৈপুণ্যে এখুনি। গলু, রণ, শ্যাম ও ক্যাওড়াপাড়ার আর পাঁচটা মেয়ে মদ্দ কেবলই জিজ্ঞাসা রাখছে পরস্পরের কাছে :

ফিরেছে ?

ফিরল ?

ফেরে নি ?

এখনো ফেরেনি !

আর এত-সব প্রশ্নের জবাবে কালোমাংসের ভাঁজ থেকে কোথা নড়ে উঠেছে অধর ও ওষ্ঠ : নাহ্, না, নন্না। এই ব্যাপক তল্লাশিতে এখ সতুও অংশীদার। টালিগঞ্জ ব্রিজ, চারু-মার্কেট, শেতলার থান, লোহাপট্টি ট্রামরাস্তা প্রভৃতি জায়গায় সে অন্ততপক্ষে তিন দফা ঘুরে এসেছে। আর যত অন্বেষণ তীব্র হচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে ও এই সংশয় প্রচার হচ্ছে ততোই যেন অন্বেষণে মন্থরতা আসছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ক্ষেমি আর কোনোদিন আর কখনো ফিরবে না, তার এই যাত্রা যেন একপ্রকার নির্দিষ্ট ছিল, যেন-বা তারা জানত। তারা জানত এমনটা হবে এরকমই হওয়ার কথা।

পুরাতন অন্ধকার তখন গ্রাস করেছে যেখানে যত ছিন্ন আলোক ও আলোকবিন্দু। ইতস্তত যা জল-স্রোত সবই এখন কালো মাটির ওপর যা-কিছু গঠন সমস্তই অন্ধকারের আকার, অন্ধকার সর্বগ্রাসী। তাতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যাবৎ ব্যবধান, চরাচর ভদ্র গেরস্থি সমেত ত্রিভুজ ভূখণ্ড একাকার, উপরন্তু মানুষের নড়াচড়া আজ সাম্প্রতিকতম ঘটনা কেন্দ্রিক। উকিল-দাদু নিজবিবেচনায় থানায় গেছে কেস লেখাতে কানাইদা করিৎকর্মা লোক, ক্ষিপ্রগতিতে সে গলুদের পাড়ায় এসে গেছে : তখনই বলেছিলুম শামুকে···বুড়ো হাড়ে অ্যামন কেত্তন করে বেড়ানোর কী দরকার···।

রাতের ওজন বেড়ে চলে, অন্ধকার ঘন ও নির্ভেজাল, এক এক করে অনেকে ফিরে গেছে। এখন গলুদের দাওয়ায় বউ-ঝি আর চুনোচানা

দল পড়ে আছে বেরালের মতো, তাদের শ্বাস-ধ্বনি ধারাবাহিক। পানাপুকুরে তখন ছায়া দেখা গেল, ছায়ায় গতি ছিল এই স্যাঁতসেঁতে ভেজা পাড়াটায় জেগে উঠল হুম্ হুম্ ধ্বনি। এতাবৎ যে শুদ্ধতা ছিল ঐ ধ্বনির তীব্র আক্রমণ তা নস্যাৎ করায় চাঞ্চল্য। মানুষ-ব্যস্ত হয়ে পড়ল, গলুর দিদি হ্যারিকেন হাতে ছুটল। হ্যারিকেন আলোয় সাঁকোটা অংশত মেলে দিতে লাগল শাদা রঙ, একসময় মানুষ-জনও দেখা গেল। ডোবায় তাদের শরীরের ছায়া গতিময় আর চীৎকার : পিসি গো!

পানাপুকুর কেঁপে ওঠে, সেই চীৎকারে সড়সড়িয়ে জলে নেমে যায় মেটে-রঙা ঢোঁড়া সাপ, ছলাৎ শব্দ থাকে পুকুরে. কী যেন ডুবে যায়। কী যেন ডুবে গেল!

ক্ষেমির এই চলে যাওয়া পর্যায়ক্রমে এনে ফেলে স্মৃতির যাবতীয় ঝাঁক। পুনর্বার উদ্‌ঘাটিত সেই কালপঞ্জী। আর যেহেতু তার এই মহতী যাত্রায় বিদায়ী শুভেচ্ছা থাকে সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপট্টির, ফলে সকলে বাধ্য থাকে এই পরিক্রমায়। সঙ্গী হয়।

এখন বিকার সাহেব-সুবোর হ্যাটকোট চাপিয়ে, ফর্সা রঙে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করে জানায় ধর্ষণের কাহিনী। সমগ্র জীবনকালে ক্ষেমি দু-দুবার ধর্ষিতা হয়েছিল, একবার ফর্সা আরেকবার কালো চামড়ার মানুষ ছিল সেই বলাৎকারের নায়ক। কবে যেন মন্থরগতি ছিল, জর্দা সুরভিত পানের শ্বাস ছিল. জুড়িগাড়ির ছিপটিতে ছিন্ন বাতাস ছিল। গাঁদীবাবার কথা, বাবার চেলার কথা উল্লেখ করে ক্ষেমি জোড়হাত কপালে ঠেকায়। সে কাঁদে, ধ্বনিবিহীন সেই কান্নায় কেবল অশ্রুপাত, ঐ অশ্রুপাত মায়া। মায়া কান্না, যার অন্তিমে মৃত্যু।

এভাবে দুদিন বেহুঁশ কেটে গেল, ক্ষেমির শরীরে শুধু আগুন আগুনের শরীর। অন্নর বাধা, নিষেধ বিস্মৃত বলে সরি ও সন্তু বসে থাকে গলুদের দাওয়ায়। তারা প্রতীক্ষায় আছে। দুদিনের সেই উগ্র প্রতীক্ষায় ক্যাওড়া পাড়ায় নেশাগ্রস্ত শরীর বড়ই ঢিলে। কে যেন চলে যাবে তারই প্রস্তুতি থেকে যায়, ক্ষেমির চোখ মুছিয়ে দেয় কেউ! আর সেই ফাঁকে শূন্য থেকে থলথলে নীল রঙ গলুদের ঘরে লাফ দিয়ে পড়ল। মৃত্যু হরিধ্বনি দিল।

এই যে দন্ত তেজমন্ত
পড়লে হবেন ভোতা ॥
এই যে কেশ দেখতে বেশ
পাকলে পাটের দড়ি ॥
এই যে মাজা হবেন কুঁজা
যাবেন গড়াগড়ি ॥

হু হু জ্বর এসেছিল, ক্ষেমির শরীরে প্রলয়-আগুন ছিল দাউ দাউ। মৃত্যুর আগে কাঁপুনি ও প্রলাপ ছিল। প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা আশ্রয় করে সেই শরীর, উৎপাটিত হচ্ছিল প্রাচীন বৃক্ষ, তার রুক্ষচুল ও আউলে শরীর বনস্থলী হয়ে যায়। ক্ষেমির নেতানো শরীরে জলো ভাপ ও গন্ধ, কিছু রেখাও ছিল। বয়স চিহ্ন। চামড়ায় অজস্র ভাঁজে প্রাচীনত্ব মুদ্রিত ছিল, এখন এই চামড়াটি ছেড়ে যাচ্ছে ক্ষেমির হাড় কাঠামো। সেই ঝঞ্ঝা-সংকেত ছিল। ক্ষেমির মৃত্যু ক্রমশঃ অনিবার্য হয়ে উঠছে, তারা জেনে গেছে শোক ও রোমাঞ্চ সমেত সেই মৃত্যুই এখন দ্বারপাল। বিশ্বাস করছে মৃত্যু দেখা যায়, মৃত্যুর আকার ও বর্ণ আছে। ক্ষেমির অন্তিম যাত্রা প্রত্যক্ষ করার জন্যে তারা রাত জাগতে থাকে। গলুদের উঠোনে লম্পর ফিতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল লাল দু-একটা আলোক বিন্দু, ধোঁয়ার স্রোত। সেই স্রোতে সামান্য আলো তলিয়ে যায়, চোয়ালের অন্ধকার ও শরীর ছায়ায় নড়চড় হয়। এই রাত জাগায় তারা মুখে-মুখে মৃত্যু বিষয়ক যাবতীয় জল্পনার শেষে খুন রঙ বেছে নিচ্ছে। ঐ রক্তবর্ণই জীবন, শরীর চৌচির হয়ে ফেটে গেলে, চামড়াটি অসংলগ্ন হলে প্রকৃত মৃত্যু আসবে রক্তস্রোতে···তখন গোল হয়ে বসে থাকা মানুষজন বড় অলৌকিক, অবিশ্বাস্য।

কুট্টিবোনের ক্ষেত্রে মৃত্যু বড় আকস্মিক ছিল। যেন ভোজবাজি, তাতে অন্ন বুক ভাঙতে চেয়েছিল আছড়ে, হিংস্র মৃত্যু গোপন ছিল। যে জন্যে তা খুন, কুট্টিবোনকে খুন করা হয়েছিল। ঐ মৃত্যু বিদ্যুৎ আঘাত, তা উৎখাত করে, ভাঙে, তাতে তুলকালাম ধ্বংস।

আর ক্যাওড়াপাড়ায় ছিল ক্রমিক মৃত্যু, মৃত্যুর বিকাশ। মৃত্যু সেখানে গড়ে উঠছিল পক্ষ বিস্তারে, ক্রমে ছায়ায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণে। যাতে তার অপ্রতিরোধ্য বিজয় উদ্ঘাটন করতে থাকে প্রতিটি পব। পর্বে পর্বে সেই তরঙ্গ মস্তিষ্ক থেকে স্পর্শ করছে নখাগ্র। মৃত্যুর আশ্রিত মানুষটি থেকে একসময় তা শূন্যে কালো চন্দ্রাতপের বিস্তৃতিতে টেনে নিয়েছে মরণশীল এক জনসমষ্টিকে। অথচ কেউ এই পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে না। তারা কেউ মৃত্যু-স্তুতি করছে না। ভগ্ন স্বরে বলে যাচ্ছে ক্ষেমির জীবনপঞ্জী। সেখানে আরোপ করছে কিছু। স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার ছিন্ন বাতাস উড়ছিল পালকে, তারা পালক স্পর্শ পায়। যদিও এই সব মানুষ ধিক্কৃত মৃত্যু নিজেদের বাঁচায় বহুবার বন্দনা করেছে। আলগোছে, বেখেয়ালে কতবার বলেছে : মর! মর! তখন কি তারা মৃত্যু সচেতন ছিল না? নাকি তা কেবল স্নেহের, ক্রোধের প্রকাশ! চন্নুর মা, অন্ন, রণর ঠাকমা, এমন কি এঁচোড়ে পাকা চন্নু অবধি মন মেজাজ খিচড়ে গেলে, দুঃখ পেলে, মরার কথা বলে। সরিও। নিজের কথা মনে হয়, হায় রে সতু কতবার মরার কথা ভেবেছে!

কুট্টিবোন আর ক্ষেমিকে ধরলে সতু দু-দুটো মৃত্যু দেখল, এই দুটি মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। কুট্টিবোন মারা গেলে সে নির্বাক শোক ও শুদ্ধ ক্রোধ দেখেছে। অন্ন এক সপ্তাহ বোবা হয়ে যায়, তার কান্না এত শুষ্ক ছিল যে তা ধ্বনিবিহীন বালিপ্রান্তর, বাতাসে বালির ঘর্ষণ ছিল। বালির ঘর্ষণ শব্দে সতুর শরীরে, স্নায়ু ও কোষে বিপুল ধ্বংসকার্য চলে। সে অস্থির হয়। আর যে-মৃত্যুর কথা সে পরে জেনেছে তা কেবলই ছেদ, ধোঁয়া-মেঘ সেখানে কচিৎ ছায়া ফেলে। বাবার কথা তার খুব কম স্মরণ থাকে, এমন-কি ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনও সে সর্বদা বুঝে উঠতে পারে না। এখন তিনটি মৃত্যু পট রাজমিস্ত্রির ক্ষিপ্রতায় তিনটি দেয়াল খাড়া করে,

সুতো ধরে ওলন নেমে যায় যেন লাটিম। ওলনটা ঘুরতে থাকে, সতু ঘূর্ণায়মান ওলন ও দেয়াল তিনটি দেখেছিল। একেকবার ভয় ঘামাচ্ছে তাকে, তখনই মৃত্যু ঝেড়ে ফেলছে ডানা। পালকহীন সেই ডানার বিস্ফার বড় ঘৃণ্য, কদর্য। তাতে ভেজা, হন্যে শকুন ছু ঠ্যাঙে লাফ মারছে। লাফ মারতে-মারতে ঐ কদর্য জীব বদলে নিচ্ছে অবস্থান। সতু অন্নর কথা ভাবছিল, কারণ অন্নর বয়স হয়েছে, সে ক্লান্ত। ক্লান্ত হলে কি মানুষ মরে যায়?

ক্ষেমিকে যারা সাঁকোর ওপর দিয়ে বয়ে আনে, যারা তাকে আবিষ্কার করে, তাদের স্মৃতিতে এখনও জাজ্বল্য আছে কুকুরের চীৎকার ও অনুসরণ। কাঁচা নর্দমার ধারে ক্ষেমি মুখ গুঁজে পড়ে ছিল···তখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাকত হারাচ্ছিল, ফলে অনুভূতি···সে অন্ধকার দেখছিল ···বিচ্ছেদ ছিল···আর বাসের অপেক্ষায় থাকা মানুষ, আলসে, আড্ডা বাজ ছোকরা এবং শিশুরা ছিল তাকে ঘিরে! ক্ষেমির ওভাবে অচৈতন্য থাকা ক্রমশ অচৈতন্য হওয়া, রচনা করে স্থায়ী কয়েকটি মুহূর্ত যাতে লোকজন আটকে যায়। আর এই ভিড়ের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকা তিনটে লেড়িকুত্তার এমন আচরণ যেন তারাই মনিব, ক্ষেমি এখন তাদের হেফাজতে আছে। তারপর সমস্ত রাত ঐ তিনটে কুকুর প্রহরায় ছিল। তারা যেন ক্ষেমিকে বহুদূর অনুসরণ করবে এরকম প্রতিজ্ঞা, আন্দোলিত লেজেও সেই উত্তেজনা। উত্তেজনায় হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসছিল গোপন নখ, ঘর্মাক্ত জিভ ভেজাচ্ছে মাটি।

অথচ তারা চারচক্ষু নয়। নেই বিশাল নাসারন্ধ্র। ফলে তারা কৃতান্ত নয়, যমের অনুগামী নয়। নেহাতই লাথ ঝাঁটা ও অবসর আদরে বেড়া ওঠা গু মুতে মুখ ঘষা পার্থিব ঘৃণ্য জীব···তারা কেন এই অন্তিমে একাগ্র থাকছে। তারা কী অলৌকিক টের পেল ঐ অন্ত!

আর আশ্চর্য! ত্রিলোক সংহারক মৃত্যু, সবুজ স্রোত চঞ্চল ক্ষেমিকে তৃণবৎ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ক্যাওড়াপাড়ার বয়স্কা নারী জানায় যে সে সবুজ দেহধারী রক্তবর্ণভূষিত যমকে চাক্ষুষ করেছিল। ক্ষেমির শিয়রে অগ্নিময় যম ছিল, রক্তবর্ণ ঐ আগুন, যা যমের ভূষণ। তখন সে

এমন কি লক্ষ্য করেছিল কুকুরের বর্ণ বৈচিত্র্য। এতে সেই নারী গুরুত্ব অর্জন করে, তখন সে অজস্র মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঘোষণা করে ক্ষেমির পশ্চাদ্‌গামী কুকুরকে সে দাউ-দাউ আগুনে অন্তর্হিত হতে দেখেছে। ফলে রহস্য, ক্ষেমির মৃত্যুতে বস্তুত রহস্য!

দাহ করে এসেও ক্যাওড়াপাড়া একটা গোটা দিন ক্ষেমির সঙ্গেই কথা বলেছে, কেঁদেছে। কান্নায় নেশাগ্রস্ত তারা খুলে রেখেছিল দরমার ঝাঁপ, কপাট ; এঁটোকাঁটা, ডুরে শাড়ি রোদ ও হিম পেয়েছে যুগপৎ।

খাইছস ?

গলুকে জিজ্ঞাসা করা হয়। চনুর মা তখন যে-ভাবেই হোক ভূতগ্রস্ত গলুকে সান্ত্বনা দেবে। সে বদ্ধপরিকর। চনুর মার মধ্যে তখন প্রত্যক্ষ করা যায় সেই-সব চেষ্টা যাতে প্রমাণ থাকে সে নারী, সে মা। তার বালবাচ্ছা আছে, বড় ভালোবাসেসে, ভালোবাসতে পারে। উদ্বেগ ছিল, সে গোপন করছে অশ্রু-ঔদাস্য, মৃত্যু-প্রতিক্রিয়া। এই পরিস্থিতিতে সে যদি গলুকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে একমাত্র তা হলেই চনুর মা বাঁচে, তার অস্তিত্ব রক্ষা পায় ফলে উৎকণ্ঠা তীব্র এবং ব্যক্তিগত। সে পুণর্বার ঐ সম্বোধন রাখে, আরো আর্দ্র।

চিরকাল কেউ থাকে না···

অন্ন বড়ই আন্তরিক, তাতে শোক ঐ বালক থেকে সত্তুর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, সত্তু সরু-সরু শেকড় দেখছে, দেখতে পায়, শেকড় মাটিতে ও শূন্যে, সমস্ত উজ্জ্বলতা ও রোদ তাতে জালি ফেলছে।

চিরকাল কেউ থাকে না···

অন্ন যেন-বা লটকে দিচ্ছে নগ্ন বৈদ্যুতিক তারের জটিল-বিন্যাস···ঐ সব তারে গতি আছে, ঐ তার প্রত্যক্ষ বিদ্যুৎ, ফালা দিচ্ছে আকাশ, তীব্র শাদা ও বক্র রেখায় তা এই গোলকটিতে হামলে পড়ছে···একটা খুলি কথা বলছে···চিরকাল কেউ থাকে না···

এই-সব কথায়, অনুষঙ্গে, গলু আদৌ ঘায়েল নয়, কিছুটা নির্বিকার স, গলু যেন-বা অপেক্ষায় ছিল কখন ঐ দুই নারী সরে আসবে মৃত ক্ষমির কাছ থেকে। সে জানত তাদের সরে আসতে হবে। গলু সত্তুর

দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, তখন চন্নুর মা পুনরায় ঐ প্রস্তাব রাখে : তরা এইখানে খাইয়া যাইস! চন্নুর মা কেন যে বারবার খাওয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছে! তাতে কি তারা এড়াতে পারছে সাম্প্রতিক মৃত্যু? নাকি কোনোক্রমে সে নিজেই নিস্তার চাইছে? সে ভয় পেয়েছে?

হ, আমি রান্ধুম!

অন্ন গলুর মাথায় হাত রেখে, হাত বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ বলে ফেলে। সে আরো বলে : চান করছস? এতে করে গলু যেন বন্দী হয়ে যাচ্ছে, তার হাবভাবে তীব্র অসহায়তা, বেচারা পালাতে পারলে বাঁচে···সে হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারছে না, মানিয়ে নিতে পারছে না এই কোমলতা, এই স্নেহ। গলু উসখুস করে, সে উঠে পড়ে, চন্নুর মা হাত ধরে থাকায় ফের বসতে হয়। কিন্তু গলু সক্ষম হয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে : দাদা ফিরলে এক জ্যায়গায় যাব···আজগে খাব না মাসীমা··· দাদার সঙ্গে যেতে হবে···। অন্ন এতে ব্যগ্র, তার কত উৎকণ্ঠা, সে গলুর পিঠে স্পর্শ রাখে···তাকে জীবনের গূঢ় অর্থ বোঝায়···বলে, যে যাওয়ার সে তো গেছেই···

অথচ অন্নে স্বাতন্ত্র্য ছিল। সে সতুকে বহুবার শুনিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাদ্‌পট, যাতে মিথ্যার, কল্পনার প্রলেপও ছিল।

সতুর বাবা মারা যেতে তারা চন্নুদের মাটকোটায় এসে ওঠে··· সাহেব-খুনের মামলায় সতুর বাবা টানা আট বছর জেল খাটে···জেল থেকে বেরিয়ে আসে কঠিন-ব্যাধির কম্বল জড়িয়ে। একসময় মারা যায়। তবে পিতৃপুরুষ জমিদার ছিল, সুবর্ণ ধান্য-স্রোত ছিল, মঙ্গল-মৎস্য···আর 'আমার বাবায় ইশ্‌কুল বসাইছিল', এই কথার সঙ্গে অন্ন উচ্চারণ করত সেই দুর্ভাগ্য : কপালের ফ্যারে এইহানে আসছি তাই বইলা তুই আর গলু তো এক না!

অন্ন ক্ষেমির শিয়রে পুরো রাত শেষ করেছে, এমন-কি সে সরিকেও আটকায় নি···এখন তো গলুর প্রতি তার অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ···এ-সবে কি ঐ ব্যবধান অন্তর্হিত? নাকি সবই মৃত্যুর দাপট, নেশা, মৃত্যু কি

তাকে এতখানি অ-পার্থিব করেছে···মৃত্যু রহস্য।

নিউ ইণ্ডিয়া টুলস-এ পুরোদস্তুর একটা কারখানার জন্যে যা যা প্রয়োজন সবই ছিল, মায় নেপালি দারোয়ান পর্যন্ত, দারোয়ানের খাকি উর্দির ওপর সেই প্রতীক ভোজালিও। তাতে হাঙ্গামা, রক্তপাত। কেউ কি ভোজালির কোপ খেয়ে অনিবার্য ছুটে যাবে? গর্হিত অপরাধ ঘটবে এরকম অনুমান থাকে বাঁকা অস্ত্রটিতে, অস্ত্রটির চামড়া-আচ্ছাদনে। অস্ত্রটির ফলায় অর্ধবৃত্তের ঝোঁক, তাতে ক্ষিপ্রগতিও আছে। অনুমান ঐ নিরীহ দারোয়ান হঠাৎ এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলবে ঝিমুনি, আলস্য, অস্ত্রটি তাকে হিংস্র করবে। হয়ত শাদা রৌদ্র তখন তার সরু চোখে সরাসরি বিদ্ধ, কোমরের গ্রন্থিতে ঐ অস্ত্র-স্পর্শ পয়দা করবে নির্বোধ অত্যাচার। সে ঘাতক হয়ে যাবে।

যদিও টুলে বসে ঝিমনোই মূলত তার কাজ, মাঝে-মধ্যে গেট খোলে ও বন্ধ করে।

ক্রমে লাইনের ঢাল ও দূরের জলাশয়ের অন্তর্বর্তী কারখানা শেড-চিমনি ও ধোঁয়ায় একটা সমঝোতা গড়ে ওঠে, কারখানাটা আস্তে আস্তে ক্যাওড়াপাড়ায় গৃহীত হয়েছে, শূণ্যে চিমনির সামান্য লাফটিও বরদাস্ত করা গেছে। মোটের ওপর এখন তার আর পৃথক অস্তিত্ব নেই, যেহেতু ক্যাওড়াপাড়ার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সবুজ বিন্দু, সাঁকো ও জলাশয়কে রেহাই দেয়, ফলে এই নিসর্গে কারখানা ঈষৎ বৈচিত্র্য এনেছে। তেজপাল গলুদের পাড়ায় হরদম যাচ্ছে-আসছে। শুরুর দিকে তেজপাল ঐ টুলটিতে বিষণ্ণ ছিল, অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা ছিল। তখন ভোজালিটি দীর্ঘ মনে হত। তেজপাল এখন বাচ্ছাদের পেছনে লাগে, হো হো হাসে, ধার-হাওলাত দিচ্ছে নামমাত্র সুদে।

পানবিড়ি ও চায়ের গুমটি দোকান গড়ে উঠবে বলে জমিজমার ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়, তাতে খুনোখুনি হতে পারত। যে ছোকরা পয়সা দরমার ঝাঁপ, ভোটের চাটাই-পোস্টার এই-সব জোড়াতাপ্পি লাগিয়ে ঐ গুমটি বানায়, সে কিংবা ক্যাওড়াপাড়ার কোনো অভিজ্ঞ লোকও ভাবতে পারে নি এজন্যে জমির মালিকের খোঁজ ও পরামর্শ নিতে হবে,

এমন-কি ভাড়া দিতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে সেই উদ্যোগী ছোকরাকে ঠাণ্ডা মাথায় সবটা বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছে কানাইদা : দ্যাখ আজ অব্দি এ পাড়ায় থানা-পুলিশ করতে হয় নি···তুই কি হাজত যেতে চাস ? এ তো আর আগেকার আমল নেই···এখন কিছু করতে গেলে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হবে।

তারা ভয় পায়। ছেলেটা ভয় পেয়েছে। কাগজ-কলমে তার ভয় ছিল। অথচ থানা-পুলিশ হুজ্জোত ভাবতে পারছিল বলে চট করে এগোতে পারছে না। সংশয় থাকে। তখন ঐ ঠাণ্ডা মেজাজ ফুরসত পায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। তাকে বোঝানো হয় এতে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, বরং ভূসম্পত্তি-বিধিই এরকম, বছরে নামমাত্র একটা টাকার চুক্তি হবে, সে পারলে দেবে, না-পারলে দেবে না। কিন্তু স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হলে, যখন তা করার মতো অবস্থা হবে, তখন দস্তুর মতো গুনে দিতে হবে। চন্নুর দাদু তখন থুতু দিয়ে নোট গুনে নেবে। ছোকরা জানত দোকান চলবে, তাকেও কিছু একটা করে খেতে হবে, ফলে সে রাজি হয়। এই বৃত্তান্তটি ক্যাওড়াপাড়া মেনে নিতে পারে নি। ব্যাজার ভাবসাব ছিল। তিনকড়ি ছোকরা তো ক্যাওড়াপাড়া থেকে আলাদা কিছু নয়। এর জন্যে এত লেখালেখির কী আছে ! অর্থাৎ ঘোরতর সন্দেহ অবিশ্বাস। অথচ তারা তো কখনো কিছু নেওয়ার ধান্দা করে নি। এত অবিশ্বাস কেন ? আগেকার আমল নেই মানে কী ? কী নেই ?

তখন এই কারখানা বড় মলিন এবং এই অলকাপুরীকে কেন্দ্র করে সচ্ছল-জীবনের যে ভ্রান্ত গুঞ্জন বিস্তৃত ছিল সে- সবই কর্পূরধর্ম ! অথচ সমুদ্রতরঙ্গ ছিল। এই কারখানায় প্রশ্রয় ছিল মুক্ত কল্পনার। এখন তা কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়ার শরীর। তীব্র কোলাহল নির্বাপিত।

কী নাম ?

গণেশ ক্যাওড়া।

বাপ কা নাম ?

নিমাই।

ঠিকানা ?

ক্যাওড়াপাড়া।

বয়েস?

তিরিশ।

মুটে-কাজ করেছিস আগে?

হুঁ।

জন্মদাগ দেখা···বাহাদুর ছাতির মাপ নেও···

প্রবল উত্তেজক কয়েকটি ঘণ্টা এভাবে বাচাল ছিল।

সুলতান আলম স্ট্রিটে তার পরও ধুলো-বাতাস ছিল রেণু রেণু। বাতাসে ধুলোর অবয়ব, ভ্যানগাড়ির গতি ও ওজনই ঐ অবয়ব খোদাই করেছে। ফলে যে আঁধি তাতে তুলকালাম কাণ্ড। যদিও তা ঝড়ঝঞ্ঝা নয় এই ধুলোট আলোড়ন, শুষ্ক সঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যদিও মাটির ওপর হাত-খানেক শূন্যে ধূলিকণা পরস্পরসংলগ্ন হবে বলে ক্ষিপ্র। ধুলো-ধোঁয়া গড়ায়। এভাবে ঐ ধুলোট-আবর্তে, আশু ভাঙচুর, ছিন্ন-পালক, বালিকার কেশ ও একটি ঠোঙা ওড়ে।

প্রচার তাদের জীর্ণ কুর্তায় সূক্ষ্ম-সেলাই রেখেছিল, কল্পনা, আশা। সমগ্র তল্লাট জুড়ে গাঢ় মোহময় একটি বর্ণ-স্রোত ছিল। কয়েকটা মাস তাদের টুকটাক কাজ ও নড়াচড়ায় মদত করেছে ঐ বর্ণ, বর্ণের প্রাবল্য। এখন ভোজালির পাশ কাটিয়ে কিছু মানুষ ছুটি শিফটে ঢুকে গেলে তারা প্ররোচনা বোঝে। অস্তিত্ব-ধর্ম ছুট কাজে ঠেলতে থাকে। কারখানার নিষ্প্রাণ শিফট তখন চালু আছে। ক্যাওড়াপাড়ায় বিক্ষিপ্ত সবুজ স্রোতটি তখন ফল্গু-মৃত্যুর ইজারায় চলে যাচ্ছে।

পরিবর্ত ধোঁয়ার প্রস্তাব তখন।

ক্যাওড়াপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সাকুল্যে ষাটজন মজুর নেওয়া হয়েছে, বাইরে থেকে আসে জনা পঞ্চাশেক। লোকজনের চোখে আর আগুন-নেশা নেই, তারা ভবিতব্য জেনে গেছে। কোথাও কোনো প্রতিবিম্ব নেই অলীক। সেই-সব জেল্লা অন্তর্হিত, এমন-কি তার শোকও কারখানার পাঁচিলে পোঁতা বাহারি কাচ-টুকরোয় কেবল আলোক-বিম্ব ছড়াচ্ছে। শূন্যে, ফোয়ারা। আবার কয়েকদিনের ব্যবধানে মেশিন-

শব্দ এক-ঘেয়ে ক্লান্তি। অভ্যাস, ধোঁয়া, এখন ধোঁয়াই সত্য। এই ধোঁয়া-স্রোত ভেঙে, তছনছ করে গলু হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে ভাঙা চোয়াল আর পায়ের গাঁট। সামান্য খুচরো পয়সা আর মার্বেল ঠোকাঠুকিতে বাজনা বাজছিল।

দ্যাখ!

ই···

শালা!

কোথায় পেলি?

কিনলাম···কালীঘাট থেকে···

কী করবি!

ন্যাকা!

কেন?

লাও···কেন ন্যাকা তাও বলে দিতে হবে···যা মায়ের দুধ খেগে যা শালা···কী করে···এটা দিয়ে কী করে···মারব···রক্ত-ফোয়ারা···এই-ভাবে ধরে সোজা ঢুকিয়ে দিলেই হল নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে···বাপ বলার টাইম পাবে না।

কাকে মারবি?

তোকে।

ধ্যুৎ!

যে শালা পেছনে লাগবে তাকেই···

তখন ঐ দীর্ঘ ছুরি তাদেব মাঝখানে, রৌপ্য-রেখা, বিদ্যুৎ-অংশ।

গলু ছুরিটা খাপে ভরে নিচ্ছিল। কোথাও আলো ছিল। কারখানার আলো, সেখানে একটা ঘোলা ডুম জ্বলছিল। গলুর ঠোঁটের ওপর পাতলা রেখা। তাবা এবার রেখাটি সম্পর্কে কথা বলছে। জানা যাচ্ছে গলু সন্তুর থেকে কিছুটা বড়, সে ব্লেড ব্যবহার করেছে। গলু আরো বড় হতে চাইছে। আর গলুর ক্ষেত্রে এইসব চাওয়া বড় সক্রিয়। সন্তুও তো ভেবে-ছিল কারখানায় ঢুকে যাবে কিন্তু তা ছিল অলস। সে কিছুই করে নি। এমন-কি লাইনেও দাঁড়ায়নি। সন্তুর শরীর তাকে বিপরীত অনুভব

দিয়েছিল। সে ওভাবে থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে না। শরীরের এই নির্দেশ সে সবটা বোঝে নি ফলে অন্ন আর সরিই যেন বারবার শাসিয়েছে : সত্নু! ছিঃ···ছিঃ···ছিঃ সত্নু!

এত ধিক্কার ছিল।

তরে দেইখ্যা ক্যামন খুশি হইব·· তর বাপের ছুটোকালের বন্ধু··· হোগলার বেড়ার আবডালে লুকাইয়া রাখছিল দুই-জনারে···অমা! দারোগা আইতেই চিক্কইর দিয়া উঠল : বন্দে···এ···মাতরম্···বন্দেএ ···এ···

'বাপরে কী নেশা! বন্দেমাতরমের নেশা! তর দাদু তো গায়ের জ্বালায় খাবলা দিয়া পড়ল : অতি-সাইরা! হারামজাদা! একদিকে দারোগা-পুলিশে তাগো টানে, আরেক দিকে তর দাদু তাগো পিটায়··· আমার আর তখন বয়স কত! বড়জোর চৌদ্দ হইব'···কাওড়াপাড়া পেছনে ফেলে তারা জিরিয়ে-জিরিয়ে হাঁটছিল।

অন্নর কানে তখন পেনশনের টাকার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ, কালুকাকু যেন আবার পদ্মাপাড়ের বেতবন, হোগলা বন ছাড়িয়ে আকাইলা পিসির সুপারি-বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে, টাকার থলের মতো। আর শব্দ হচ্ছে। ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ। ফলে স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি কখনো সত্নুকে, সত্নুদের ছেড়ে যায় না। তারা সর্বদা সেই স্মৃতির শাদা এবং কালো গর্তে থাকে। সত্নুর বাবার কথা উঠলে ঐ তেরঙ্গা পতপত উড়বে···তাদের কষ্ট ও খিন্নতায় অ-সহযোগ আন্দোলন ঠেঙাতে অজস্র ব্যাটন ছুটে আসে···শূন্যে খালি জুতো ও চাপ চাপ রক্ত থাকে। আর এখন প্রাক্তন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর স্ত্রী হিসেবে অন্ন সরকারি পেনশন পেতে চেষ্টা করছে, এখন এই পেনশনই স্বাধীনতা।

এভাবে তারা স্বাধীনতার জন্যে এগোয়, সামনে ডবলডেকার, ট্রাম-ঘন্টি ও হুস্‌স শব্দ, অ্যাসফল্ট রাস্তা পেরিয়ে ঘাম, লালপাগড়ি হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে নিয়ন্ত্রণ। ধুতি, প্যান্ট, সার্ট ও তৎপর লুঙির সামনে তারা থামছে। অন্ন তাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছিল ফালি কাগজ

'ভ্যাখেন তো দাদা! কই হইব?' ঐ-সব ধুতি, প্যান্ট, সার্ট ও লুঙি স্বাধীনতা জানে না, দেখে নি, তারা জানে না এই নারী ও বালক কী গভীরভাবে সেই ছিন্ন মেঘের সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই জিজ্ঞাসায় তারা কেবল একটি ঠিকানা, সিঁড়ি ও দরজা দেখতে পায়, আবার সে-সবে আলস্য থাকায় সরু, মোটা ও লিকলিকে আঙুল উদাস কোনো দিকে উঠে যায় তাতে সমস্তই আনদিষ্ট। এভাবে তারা হয়রান হচ্ছিল, জনস্রোত বড় নির্বিকার, প্রকৃত অচেনা, যেন-বা তারা একই ভাষায় হৃদয় চালাচালি করে না, কোনো জাতীয়-সংগীত নেই। অন্ন থেমে ওঠে, সে সতুকে আশ্রয় করে, তার আর জিজ্ঞাসার সাহস হয় না, যেন-বা সে হারিয়ে ফেলছে প্রশ্নাবিদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা : তুই জিগা।

এভাবে তারা আফিস বাড়ি, লাল পাগড়ি ও উর্দির পাশ দিয়ে হেঁটেছে। মূল্যবান কাগজটি সর্বদা ধরা ছিল হাতে, কিন্তু কিছুতেই কাঠের সিঁড়ি সমেত লর্ডের বাড়িটা খুঁজে পেলনা। কাগজের টুকরোটি মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে, শাদা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন কেবল সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছে এরকম : এই ঠিকানায কোনো বাড়ি তো ঠিক···! তাদের পরিক্রমায়, অন্বেষণে, সময় বড় শ্লথ, ক্লান্তি দীর্ঘ ছায়া ফেলছে। অন্ন আশা করেছিল, পেনশনের টাকায় তার নির্ভরতা ছিল। এখন ক্রমে অনির্দিষ্ট যাত্রা, ব্যর্থতা ইত্যাদিতে সে তৃষ্ণার অনুভব পাচ্ছে উগ্র, মরুভূমির শোনা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না প্রসঙ্গটি। কীভাবে, কবে, কোথায় সে মরু জানল। সরির বিবাহ-উদ্যোগই তাকে এত সক্রিয় করেছে, কারণ পেনশন পেলে সে গত ছমাস বাবদ এককালীন কিছু টাকা পেতে পারে। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখন পরাস্ত হচ্ছে, সতুও টের পাচ্ছে অন্নর ঘাম। অন্ন ভিজে উঠছে, 'লজ্জা···আ··· লজ জা···আ'। কথাটা সে ঠিক বলছে না তবে নিশ্চিত তার শরীর এত সব গ্লানি ও ঘেন্নায় এখন ভেজা কুর্তা। অচিরেই জবজব করবে।

তর বাবায় থাকলে···

একসময় সে বলেও ফেলে।

১০ ফাল্গুন সরির গায়ে কাঁচা হলুদচূর্ণ আর কোরা কাপড়ের গন্ধ।

তুল দিছে অর জ্যাঠায়।

চুড়ি কি শুধু সোনার ?

না ব্রোঞ্জের, অত পামু কই !

সরির রূপ খুলছে কী কন দিদি !

সরির যেন আজ পুজো হবে, অদ্ভুত এক কুমারীত্ব নিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীর মতো সে বসেছিল আর সামান্য অলংকার থেকে অজস্র তীক্ষ্ণ তীরের উজ্জ্বল আলোক-বিন্দু ছড়িয়ে পড়ছিল। বারান্দায় রাত তিনটে পর্যন্ত লালচেলি আর স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ডাবের ওপর সরির হাতটি, হাতের পাতা, পড়ে থাকে। জামাই কালাচাঁদের এক মামা তিরিশ পিস মাছ খায়, দীর্ঘ উদ্গার ওঠে, কোথাও শেকল তোলার শব্দ আছড়ে পড়ে। সধবাবিধবা আর চোদ্দ বছরের বালিকারা খলখল গলগল শব্দে গড়িয়ে যেতে লাগল। গোটা ডাব আর লালচেলির ওপর ডিগবাজি খেতে লাগল আশ্চর্য মজা : কই গো জামাই !

সারাদিনে বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্ন বলল : দ্যাখছেন নি কী গাধলা পড়ছে !

চন্নুর মা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে লতানো উদ্ভিদের এক থোকা চুল। চেকনাই পাথর বসানো জ্বলন্ত আংটি তখন লোকানো হচ্ছে জলে ও কাদায়, আর দপ্ দপ্ জ্বলে ওঠে অন্নর হাওলাতি-চোখ। চন্নুর মার মুখে তখন পাউডার, স্নো। শাদা উদাস রেণু। সে এমন চোরাগোপ্তা হাসছিল, হাত খেলাচ্ছিল, যেন তার শাদা গোল হাত-তুটোর ওপর দিয়ে কত মেয়ে তরে গেছে। কতবার সে আংটি হাপিস করেছে, পুকুর বানিয়েছে, ছড়া কেটেছে, আর উলুধ্বনি···এবং সর্বদা তার গালে পান ছিল, নাকে একটা শাদা পাথর।

···সতু হারিয়ে যাচ্ছিল মাংসের বালতি, লুচির গন্ধ ও সংস্কৃত মন্ত্রের ভেতর। সে তখন বিছানায়, যেন বালিশ। বিয়ের রাতে সতু এভাবে জলদি ঘুমিয়ে পড়ে, তার মাথায় ওজন ছিল। ভারি মাথা ক্রমে ঝুঁকে আসে বুকের দিকে। সতুর হাঁটু ও মাথা বড় কাছাকাছি ছিল, শরীর

অর্ধবৃত্ত, ধনুক। স্নায়ুমণ্ডলী জট খুলে ফেলছে, যেন-বা গড়াচ্ছে একটি উলের বল, পশমের অনুভূতি, ধোঁয়া-ধোঁয়া, হামা দিয়ে ঘুম আসছে। তার এই ঘুমে বিবাহপর্ব, ঐ আংটি-খেলা, সমস্তই ঢুকে গেছে।

চন্নুর মা এখন হাই তুলছে, তুচ্ছ পোকা নড়ে আলজিভ, জর্দার ভুরভুর গন্ধ। ন্যাড়া পেয়ারাডাল, খাটা পায়খানা আর চাতাল ফেরত দিচ্ছে তখন উগ্র দুর্গন্ধ, ঐ গন্ধের গতি বারান্দার দিকে। বাতাসের হামলা। বারান্দার ফাট ধরে পিঁপড়ে রেখা কোথাও অন্ধকার গর্তের দিকে চলে গেছে। বারান্দায় চন্নুর মার আলগা শরীর, শায়া ও শাড়ির পাড় ধরা আছে। তার শরীরে অ্যালা ধরেছে, সে দু দিন বড় বেশি কথা বলেছে, বড় উদ্যম ছিল, এখন সেসবই পায়ের গোছ বেয়ে ঘাম স্রোত।

দূর শূন্য ও নিকটে তখন রুপোলি সুতো টানটান, সংযোগ, কী-যে যুক্ত নয় তাতে! টেলিগ্রাফ-খুঁটি বৃক্ষের মহিমা পেয়েছে, ক্ষুদ্র পাখির চোখ নিশানা। রৌপ্য-তারে নাকি সমগ্র দেশ সংলগ্ন আছে, তামাম মানচিত্র কথা বলে তাতে। আর এখন ঐ তার চাবুকের উপমা। দুপুরের স্বৈরতন্ত্র শাসন করছে সমগ্র তল্লাট।

মালক্ষ্মার এক দায় মিটল···অ্যাহন ছাওয়ালডা মানুষ হইলেই···

দীর্ঘ হাই সমেত কথাটা উচ্চারণ করে বৃদ্ধ দু আঙুলে ভুঁড়ি দিচ্ছে, আলস্য পোষ মানাবে যেন। তার ঘুম পায়, নরম রোদ এখন রেশম। বিস্তৃত বারান্দায় শীতল ছায়া আর দুপুর অতিশয় গভীর, স্তব্ধ। বারান্দায় ভগ্ন শালখুঁটি, ছাগল নাদতে থাকে সেখানে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতার আগে ও পরে প্রলয় যুদ্ধ এই বৃদ্ধকে দুনম্বরী ব্যবসায় উন্মাদ করেছিল। দরিদ্রনারায়ণ সেবা বেশ কিছুকাল স্থগিত আছে। ঐ বৃদ্ধও ইতিহাস বলে যায় অনর্গল। এখন সে জ্বেলে দিয়েছে বিপদ্-সিগন্যাল। সদু বিশ্বাস করছে অন্ন যা প্রত্যাশা করে, যা যা ভাবে, একদিন সমস্তই হুবহু ঘটে যাবে। দিদির বিয়ে হয়ে গেল, অন্ন জানত এরকম হবে। যেমন চন্নুর দাদু এখন বলল সব কিছু ঐ ভাবে মিলে যাবে, মিলে যাওয়ার কথা। সদু সেই 'ছাওয়াল' যার ওপর ন্যস্ত আছে জটিল এক দায়ভার। সে জানে, আজ এই মুহূর্তে জেনে যাচ্ছে। তাকে লেখাপড়া শিখে বি.এ.

এম. এ. আরো অজস্র পরীক্ষা চৈতি সংক্রান্তির কাঁটাঝাঁপে পেরিয়ে যেতে হবে। 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক', এবং 'বড় চাকুইরা' হতে হবে··· যেমন তার লতায়পাতায় সম্পর্কিত ধলা-মামা, ফুলদি ও সোদপুরের কাকু। অন্ন তখন সতুকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথ ধরে মন্থর হেঁটে যাবে : অখন সতু তো এম. এ. পাশ দিছে···সরকারি অফিসার···হইলে হইব কি ছাওয়ালের মায় বলতে প্রাণ···অখন সতুর বিয়া দ্যাওন লাগে···আইসেন হগলে···

নিশ্চিত জানা যে সেই দিন আসছে, আনবে এই দুর্বল, অপুষ্ট, রুগ্ন বালক, যার দু-দুবার টাইফয়েড হয়ে গেছে বলে নিরর্থক ঘামে আর কেবল খিদে পায়।

ছাওয়ালডা গ্যালো কই!

সতু! অ সতু!

বস্তুত গত দু দিনে অন্নর সঙ্গে সতুর কোনো শব্দ-বিনিময় ঘটে নি। হতে পারে তা বিয়েবাড়ির ধর্ম, বা ঐ শোলার মুকুট, তেল-ঝাল-গন্ধ তিনটি প্রাণীর মধ্যে ঢুকে পড়ে কালকের মতো, শূন্য স্থান করে নেয়। আর যতটুকু কাল ঝরে গেছে তাতে অনুভব, উদ্বেগ-ও। অন্নর এই সম্বোধন ভিন্ন অর্থ পাচ্ছে সতুর কাছে, সে যথার্থই কোথাও গেছে, কিংবা এর পর তাবৎ নৈকট্য ধারণ করবে বিচ্ছেদগান। সতুর কী অভিমান ছিল, সরিৎ আশু গমন কি স্থায়ী গর্ত খুঁড়েছে, ধ্বস. যাতে সম্পর্কের জোড় খুলে যায়। এখন হাঙ্গামা ঢুকে পাওয়ায় অবসাদ, ফলে শরীরের অ্যালাভাব কাটিয়ে তারা ফের পরস্পরের কাছাকাছি আসতে চাইছে। ভগ্ন শালখুঁটির আশ্রয়ে। সে অন্নর মুখোমুখি হয়।

আইজ দিদির সঙ্গে যাবা!

নাহ্।

শোন তো আগে···

জানি, দিদির শ্বশুরবাড়ি, আমি যাবো না।

দিদি চইলা যাইবো তর মন খারাপ করবো···

নাহ্।

সতু!

ভুল হইয়া যায় বইন···কয় দিকে যাই···মনে থাকে না হগল সময়।

হেই ছ্যামড়া কই ?

আমার কপাল ! হে কি ঘরে থাকনের পাত্তর···।

ডিউটি-ফেরতা ফায়ারম্যান কালাচাঁদ হুট করে আসে যায়. কখন-ও রাত্রিবাস করে নীলকুর্তা আর পাৎলুনে তার শরীর ঢাকা। সঙ্গে একটা টিফিন-বাক্স. গামছা, লুঙ্গি আর এক টুকরো কাপড়-কাচা সাবান থাকে। খাটের ওপর সতুর আর সাবির বরের বিছানা হলে সে অন্নর সামনেই বিড়ি ধরায় : আপনের মাইয়ায় কইতেছিল···। সরল, আন্তরিক কত কী বলে যায় সে।

অনেক পরে অন্ন বলে : আহনে ঘুমাও !

ইতিহাস-ভূগোল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেও অঙ্ক তার জন্যে গণিতশাস্ত্রের বাঞ্ছনাময় শূন্যটি ধরিয়ে দেওয়ায় সতুকে অদ্ভুত সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কে নির্জন দিন হচ্ছে কর্মময় দুপুর। অথচ এই দুপুর সর্বত্র ওড়াচ্ছে, ছোটাচ্ছে হাফ-প্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট, দুপুর কী অসম্ভব গতি সঞ্চার করে, ঝটপট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বদল করতে হয়, কী মত্ততা এই শুষ্ক নির্জনতায়। গ্রীষ্মাবকাশ, গ্রীষ্মকালীন এই অবকাশ এক প্রবল জলস্রোত, শব্দ, ভয়ানক ক্রীড়া, রোমাঞ্চ ! তৃষ্ণার্ত শরীর ফেটে যায়, ঘামের আশ্রয় চায়। সে দরদর ভিজতে চায় ঘামে. তখন হাসি, নির্দয়, শাদা।

তখন তারা, সে, গলু ও রণ. ভেলা ঠেলছে। ডোবা তখন-ও কালো জল, গভীর, স্থির। কচুরিপানার ভেলাটি মাঝ-বরাবর ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, জল ভাঙছে লগির শব্দ। জলের শব্দ। গলু লাফিয়ে উঠছে, গোড়ালির চাপে ভেঙে দিচ্ছে। সেখানে জল ঢুকে পড়ছে, ভেঙে দিচ্ছে সেই তুচ্ছ ভেলা। আলগা পানা দূরে যাচ্ছে, ভেলা ক্রমে ছোট হতে থাকে। রণ সাঁতার জানত না বলে সর্বদা আগাম নিরাপত্তা চেয়ে নিত : বেশি দূর যাবি না কিন্তু ! রণ হেসে ফেলত, আসলে জানাই যে যাবে, না-গেলে কোনো মজাই নেই। মাঝ-বরাবর এসে গলু যখন পা দিয়ে ভেলা ভাঙতে থাকে, জল তখন বিপজ্জনক, নির্দোষ সেই বিপদ চিনিয়ে দিচ্ছে

প্রতিটি রোমকূপ। একসময় তারা ফিরে আসে, কেউ মরে না. অথচ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থাকে। ফলে ডাঙায় উঠে হাসত, পরস্পরকে ধাক্কা দিত আর প্যান্টের পট্টি নিঙড়ে জল ঝেড়ে ফেলত। মারাত্মক অভিযান, ভয়ংকর কিছু করার এক আগুন-স্রোত থাকত. কাদায় তারা আছড়ে পড়ত পরস্পরের ওপর, শরীর তখন যেন বুঝে গেছে প্রলয়-তাকত। তাতে অস্থিরতা। এই অস্থিরতায় সন্তু জলা ও সাঁকোর অস্পষ্ট প্রান্তে, বেঁধে যায় ভাস্কো ডা গামার গান-বুট ও ঘাড়ের পালক দেখেছিল নিখুঁত। এত কিছু জলের তলায় তারা উলঙ্গ এবং সন্তুর বাবা হয় দুর্দান্ত অভিযানে, এই বাবার অনেক নিচু ভিড়ের ভেতর সন্তু যথার্থই সিঁড়ি ভাঙে।

দূরে ট্রামরাস্তায় তাদের সাট বাতাস পেয়ে ফুলছে, জানান বিভ্রম।

ঘড়িঘর ছাড়াতেই তারা সিনেমা হলটি পেয়ে যায়. গলু হঠাৎ গম্ভীর 'দেখবে নাকি?' বলে প্যান্টের পকেট থেকে শাদা কাপড় টেনে উলটে দিল, সিগারেটের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল। ওদের সামনে এখন দেয়ালজোড়া নায়িকা-নায়ক, নায়িকার বিশাল বুক দেয়ালে, পানের পিক ও খিস্তি। গলু সিগারেট টানতে টানতে বলে: এই ইটটা দেখতে দেখতে হামিদ চুয়ান্নি ছুড়েছিল। তারা হামিদকে চেনে না, হামিদের কথা জানতে চায় না। গলু হামিদকে নকল করল: লে চুয়ান্নি!

সন্তুর বিশ্বাস হয় না, সে হাসতে থাকে: লে চুয়ান্নি! ধ্যাৎ!

তোর বিশ্বেস হচ্ছে না, বেশ চ নিজের চোকেই দেখবি।

চুয়ান্নি মানে কি!

চার আনি…চুয়ান্নি…মজা হলে ছোড়ে।

কী মজা!

রূপকুমার লীলাবতীকে জাপ্টে ধল্লে…লীলাবতী চান করলে… নাচলে…ফাইটিং হলে…

এভাবে সংলাপ অক্ষুণ্ণ রেখে হান্টারবালি ছবির তিনটে টিকিট কাটা হয়। অন্ধকার ভেঙে গোঁত্তা খেতে খেতে এগোয়, সামনে সরু আলো কেঁপে কেঁপে তাদের ডাকতে থাকে। চৌকো অন্ধকারে তারা পরস্পরের

মুখ দেখতে পায় না, পেছন থেকে তীব্র আলোর ফোকাসে রোগা ঘাড়, শুকনো চামড়া, ঘাড়ের ছাঁটাচুল, আর ঝলসে ওঠে। শাদা পর্দা চকচক করলে, চলন্ত ট্রেন থেকে হাণ্টারবালি সত্বর দিকে জাম্প মারে···বিশাল বুক তার ক্ষুদ্র শরীর টেনে নেয় ভৌতিক।

মায়ের নাম চুটকি বাঁদী
পুতের নাম হোলতান খাঁ ॥

কী করে যেন সরির একটা আস্ত শাড়ি থেকে গেছে। দেয়ালে নারকেল দড়িতে হাওয়াই শার্ট, হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি ও থানের সঙ্গে একপাশে ঝুলছে। বেশ কিছুকাল তাতে হাত না-পড়ায় এবং ক্রমাগত সরতে থাকায় প্রতিটি কুঁচি অক্ষত। অনায়াসে কাপড়টা বেশ কিছুদিন পরতে পারত অন্ন. কিন্তু তার দ্বিধা, তার লজ্জা, এমন-কি গ্লানিও : সে রঙিন কাপড় পরে না। ফলে তার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব, বা জবরদস্তি ভুলতে পারে। তার এই ভুলে যাওয়া সতুর বিশ্বাস্য ঠেকে। অত মনে থাকার কথা নয়, কী করে আর মনে থাকে! এবার এলে সরিই হয়ত নিয়ে যাবে।

অথচ এই তুচ্ছ বস্ত্রে সরির না-থাকা কত প্রতীকী! শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সরি আছে এখনও রুক্ষ, চড়া গন্ধে⋯সেই সোনা গন্ধ উপড়ে ফেলছে স্মৃতি। ঘটনা বিভ্রাট তাতে, সময়ের পারম্পর্য ভেঙে এটা সেটা মনে পড়ে যাচ্ছে। অথচ সতু টের পায় কেমন সশব্দে ভেঙে যাচ্ছে স্মৃতির প্রাসাদ, বেদীটিতে কত ফাটল, শ্যাওলা⋯বেদীটিই ধ্বংস হচ্ছে ধ্বংস হবে⋯সরি বিস্মৃতিতে চলে যাবে।

দেইখেন মা-লক্ষ্মী⋯আপনার চিন্তা কা অন্নদি⋯না বউমা ছেলে তোমার⋯আমার আর কোনো দায়িত্ব নাই চন্নুর মা দিদি অখন সতুর⋯

এভাবে সন্তুকে ঘিরে, কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে কত শুভেচ্ছা। সরির ব্যাপারে তেমন জিজ্ঞাসা নেই, বরং স্বস্তি আছে, সরির বিকাশ সম্পূর্ণ। সে যেন বা বিকশিত হয়েছে হুবহু, যেমনটি তার হওয়ার কথা ছিল, হওয়া উচিত ছিল। অন্নর আশা, অন্নর অস্তিত্ব এখন একটিমাত্র নির্ভরতা জানে, আর তা-ই সন্তু। ঐ নির্ভরতা ও আশা আকাঙ্ক্ষায় দ্রবীভূত স্নেহ, এবং সাফল্যে একটি গণ্ডিও থাকে। টের পাওয়া যায় সে নিজেই সব নয়, সন্তুর উচিৎ অনুচিতের নির্ধারণও এখানে। কিছু কিছু বিষয়ে তার অংশমাত্রায় আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকার কথা, আর বিপরীতে শুধু নিরাসক্তি নয়, খাঁটি ঘেন্না থাকার কথা। এগুলো যথার্থ মিলে গেলে উকিলদাদু, চন্নুর মা ও অন্যান্যের এত সব স্তোকবাক্য, আশ্বাস মূর্ত হবে, প্রাণ সঞ্চার ঘটে যাবে।

সুতরাং আতঙ্ক। গভীর অন্ধকার গর্ত, ধাম ও সেই মারাত্মক ট্রেন আভূমি থর থর কেঁপে উঠছে কেউ কী কাটা পড়ল লাইনে! লাইনে কেউ পেতে দিয়েছিল গলা, ক্যাওড়াপাড়ার সঙ্গে তার কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! সে তার গলাটি পেতে রেখেছিল বলে একবার চাক্ষুষ করেছে রক্তের ঘনত্ব, উষ্ণতা। দুর্ঘটনার পর সরি সেদিন খেতে পারে নি, ভিড়বৃত্তে সন্তুকেও দাঁড়াতে দেয় নি: চ, দেখিস না! সরি কী খুব ভয় পেত! কেন? গলুর ভয় নেই অথচ সে ও দাঁড়াতে পারে নি, বৃত্তটি নিখুঁত ছিল বয়স্ক ও শিশুর জটলায়, দীর্ঘ কাল তারা হরণ করে নেয় পর্যবেক্ষণে। অন্ন, চন্নুর মা, এমন-কি চন্নুও স্বীকার করে নিয়তি, দুর্লঙ্ঘ্য লিখন। মানুষের কপালে ভবিষ্যৎ আঁকা থাকে এই বিশ্বাস।

দেইখেন মা-লক্ষ্মী…

তারা সমস্বরে বলে উঠছে :

জজ হইবো…

পণ্ডিত হইবো…

ভালো হইবো…

হইবো…

সন্তু কী সবাইকে ডেকে ডেকে হান্টারবালি সিনেমার গল্পটা বলবে?

ট্রেনের ছাত থেকে লাফিয়ে, পিস্তল বাগিয়ে, ছুটন্ত ঘোড়ায় ডাকাতির রোমহর্ষক কাহিনী। গল্পটা সে যেন প্রকৃতই বলছে। সকলে চুপ, ঐ স্তব্ধতায় ভৎসনা, বিস্ময়, এমন-কি ভীতিও।

কেউ চীৎকার করে উঠল : মর, মর!

মুহূর্তে সেই নারী অচৈতন্য, তার শাদা থানটিই শুধু এবং [illegible] উড়ছে, অন্নর মৃত্যু হবে।

কালো এক [illegible] বৃত্তান্ত একমাত্র সরিকেই বলা যেত, তার ধৈর্য ছিল সবটা শোনার, যদিও সরি নিখাদ সমঝদার নয় : ভিন্ন সত্য! এই ধিক্কারে কী আকর্ষণ, একটু বা প্রশ্রয়ও। তার ইচ্ছে সে তো বলতে চায় : ঠিক আছে তবে সাবধান মনে রাখিস। তাকে মনে রাখতে হবে, অনেক কিছুই তার মনে রাখা উচিত, উচিত নয়, আদিষ্ট। সে বালক। অথচ সরি না-থাকায় বৃত্তান্তটি গোপন থেকে যায়, সত্বর গোপন সঞ্চয় গড়ে উঠতে থাকে।

গোপনীয়তা কি অন্যায়? পাপ? সে কি পাপ করেছে? পাপ করছে? অন্ধকার, সুড়ঙ্গ আলোর রেখা ও দুটি ঘণ্টার শ্বাসকষ্টে, ঘামে অসাড় দর্শকবৃন্দের উত্তাপ ও শিস-[illegible] সে জ্বরে পড়েছিল। টানা দুদিন সে জ্বরে পুড়ে গেছে। এখানে অন্যায় কোথায়, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের পাপও সে প্রত্যক্ষ করে নি, কেবল অপার কৌতূহল ছিল। না-ই কি পাপ! নাকি নিষেধাত্মক হ্রস্বধ্বনি 'না' একখানি অমোঘ। 'না' ধ্বনিটিতে প্রাচীর উঠে যায় বিদ্যুৎগতিতে। বারবার এই একধ্বনির মুখোমুখি তার শরীর-গ্রন্থিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্র ও বিদ্যুৎসহ। রোমকূপে অনুভূতি, চামড়ার সমস্ত ছিদ্র তাতে আরো উদ্‌ঘাটিত।

আর সিনেমা দেখার ফল কপালে নির্বোধ যন্ত্রণা। ঘুম পেয়েছিল। জ্বর হওয়ার কারণ তার জানা নেই, তবে গলুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা তখন তার অভিজ্ঞতায় নেই বলে সে-সবই বড় মামুলি। তবে মাথা ধরেছিল বড্‌ডো। অস্পষ্ট শংকা ও উত্তেজনা ছিল নষ্ট হওয়ার। নষ্ট! কী হলে, ঠিক নষ্ট হওয়া যায়! জানা সম্ভব কি! কেউ জানে! সে তো শুধুই শুনেছে : গলুটা এক্কেরে নষ্ট হইয়া গ্যাছে···অগো আর কী!

রণ ? রণও নষ্ট ! অথচ কেউ নিশ্চিত নয়, কেননা 'অগো আবার কী' এই বিচারটি থাকায় গলু-ও নষ্ট নয়, সে তার গোত্র ধর্ম অনুযায়ী ঠিক-ঠাক আছে। ফলে ধোঁয়া, ধোঁয়ায় ছলনা নেই, শূন্য বাতাস তাতে স্পষ্ট, কত অবয়ব ভেঙে যায় তাতে ! ভবিষ্যৎ-ভাবনা চকিত বিদ্যুৎ, নীল তলোয়ার উঠে আসে, চিরে ফেলে তাকেই। তখন তীব্র স্রোত ছিল শব্দের। সদু সরির অভাব বোধ করে, সম্পর্ক খোঁজে আর অন্তর্লীন ধ্বনি-স্রোত সে তখন স্বরভঙ্গ। তার গলা তখন বড়ই কর্কশ, গম্ভীর, ফ্যাসফেসে, অথচ প্রতিটি শব্দের কী গুরুত্ব তখন !

সরি নেই, তার না-থাকা কোথাও কাঁটা নয়, যে বিদ্ধ হবে। এমন-কি কোথাও যেন তুচ্ছ মামুলি বস্তু নেই যাতে তার শরীরস্পর্শ গন্ধ। কিছুই থাকে না। রঙিন ফিতেও লোপাট। সম্পর্ক শিকড়, ক্রমে বেড়ে ওঠা, পূর্ণায়ত গাঢ় পাতা যেনবা স্মরণ করাচ্ছে একটি গাছের স্থানিক অবস্থান, ডাল। কিছু আকার, রোদ ও ছায়ার ক্ষেত্র। সরির থাকা কিংবা না-থাকা প্রকৃতই কিছু নয় যেন এমন-কি তা বিস্মরণও নয়। সে যে এখানে নেই তাতে কেউ বিদ্ধ হচ্ছে না। সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার সান্নিধ্যে যেখানে যতটুকু ক্রমিক বদল সে-সবই এক দীর্ঘ সময় নিয়ে ঘটেছে।

জ্যামিতিক এই ক্ষেত্রটি পূর্বাপর এক নয়। কিছু মানুষের থাকা না-থাকার ওপরও তো নির্ভর করে দৃশ্য। ভারী অন্ধকার, ধোঁয়া-বাতাস, বর্তুল আলো ও আলোর বুদবুদ। আলো ও অন্ধকার, আর বর্ণবৈচিত্র্য ও ধ্বনি-ময় গতি-রেখায় নিমজ্জন কী গভীর ! সরি তো কতবার সেখানে ডুবেছিল, ভেসেছিল। দৌড়দৌড়, শ্বাস-অভিঘাত ও কম্পন।

সরির ব্যাপারে অন্ন ও চনুর মা যে দু-চারটে কথা চালছে তা কেবলই তথ্য, স্বস্তি : সরি ভালো আছে···ভালোই আছে। অথচ সরি কেন ভালো আছে, ভালো কী, কাকে বলে, সেই আদত কথাটার কোনো ধ্বনি নেই, উচ্চারণ নেই। কিছু কি গোপন করা হচ্ছে ? গোপন কিছু আছে কি যা ভালো নয়, যাতে জটিল সংশয়, উদ্বেগ। সদু ঐ গোপন নাস্তি টের পাচ্ছিল। তিনটি প্রাণীর একত্রে থাকায় অচ্ছেদ্য

সম্পর্ক ছিল রক্ত-স্রোত ও স্নায়ু-মণ্ডলাতে। সে, তারা, অনুভব করতে পারত পরস্পরকে। আলো, ছায়া ও নক্ষত্রের কচিৎ ঔজ্জ্বল্যে কতবার অম্ল স্পর্শ করেছে সরিকে, সরি সত্নুকে। অম্ল, সরি, সদ্নু, তারা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তখন সরির নগ্ন পিঠে অনুভূতিময় সেই বক্ররেখা দেখা যেত। এই ক্রম পরিণতি কি আত্মসাৎ করে জল ও বাতাস? যেভাবে বিকর্ষণ তেজস্ক্রিয়, গড়ে ওঠে পাকা ফল, শাদা সূক্ষ্ম বিচি, তুলোর আশ্রয়ে ভাসা বীজ।

সরির বর আইছিল···জামাই কয় কী জানেন!···ডর লাগে··· আমার ডর লাগে···পুলাপান···সরির বয়স আর কত? আপনে তো হগলই জানেন, সরিরে ল্যাংটা দ্যাখছেন। ক্যান জ্যান ডর লাগে···

আমারে কয় অগো লগে থাকতে···

চাতালের বাস্তব পেয়ারা গাছ মায়াবী এখন, সরু সরু ডাল ধুয়ে যাচ্ছে অলৌকিক জ্যোৎস্নায়, সরির কাছে এই বৃক্ষ এখন নির্ঘাৎ স্মৃতি, স্মৃতিতে যে ধূসর দূরত্ব থাকে তা অটুট। এমন কি তা হারিয়েছে স্থানিকতা, আকার ও বিমূর্ত সমস্ত রেখা। বৃত্তের যা-কিছু নকল ও নিখুঁত কল্পনা, তুচ্ছ ও সূক্ষ্মতম বিন্দু। সবই অদৃশ্য। অথচ এই সব রেখা, বৃত্ত ও বিন্দুতেই সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার যথার্থ প্রকাশ, তা-ই মানচিত্র এতাবৎ। এখন তো গোলকটি প্রকৃতই কত ঘুরেছে, দীর্ঘ বক্ররেখায়, বৃত্তে রচনা করেছে বৎসর। শূন্যে চিরায়ত কলঙ্ক, শূন্যে নিষ্কাশিত রোদ, এই সব এক সময় ফাঁস করে দিচ্ছে, 'সরি সন্তান সম্ভবা।'

আমারে কয় অগো লগে থাকতে···

খারাপডা কী!

অ্যাহন সরির বাচ্চা হইবো, হেইয়ার লাইগা সমাদর।

তাই কন!

আমি কইয়া দিছি ত্যামন বোঝলে সরিরে রাইখ্যা যাও··তয় তোমার টাকা দিতে লাগবো।

হ।

ঠিক করি নাই? কী কন?

অন্ন এভাবে সাত-পাঁচ খুচরো সমস্যা এনে ফেলে। এত সব ঝামেলায় সরি যেন-বা অস্বীকৃত হচ্ছে, যে কেউ হয়ে যাচ্ছে, অন্য এক পরিবার, অন্য কারো কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে অন্ন। এতে জখম ছিল, গভীর চোট ছিল, নিরাময়হীন। সরির অনস্তিত্বের সকল ব্যঞ্জনা তার আয়ত্তে, সরি চলে গেছে প্রমাণ সাইজের শূন্যতা রেখে। সে, এখন শূন্যতার অবস্থান খোঁজে। তা কি অন্ন ও সতুব অন্তর্বর্তী? ঐ শূন্যতা অনড়, তাদের দুজনের মধ্যে তা প্রোথিত। ফলে দূরত্ব আছে, দূরত্ব থাকে।

কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক জটিলতা, বোধ ইত্যাদি বিস্মৃত রেখে অন্ন ক্রীড়াময়। কপট ক্রোধ ও বিরক্তির আস্বাদ পাচ্ছে। ক্ষমতারও, যা পুঞ্জীভূত ঘামে, রোমকূপে। কারণ সরির হিল্লে করে দিয়েছে এই বিধবা। এখন সরি প্যাঁচাচ্ছে নিজেকে, নিজস্ব তন্তুজালে, নির্দোষ শিশু-হাস্য সেখানে খলখল, জলস্রোত। আর কী। অন্ন হয়ত বা এর পরেই হঠাৎ এনে ফেলবে আন্তরিক বিষণ্ণ স্রোতটি: সরির প্রথম সন্তান আমাগো কত আহ্লাদের…

অন্ন যেমন-যেমন বলছে, ভাবছে, ঠিক ঐভাবে সবই মিলে যাবে। আর সতু জানে, বা আন্দাজ করতে পারছে ঐ কয়েকটা দিন অন্ন অন্নপূর্ণা। সে সরিকে বলবে: মাছখান খাইয়া ফ্যাল সরি, সতু খাইয়া ল, ফ্যালাইস না…

অন্ন দশ-বিশ টাকা ধার করে ফেলবে। প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক এই ঋণের ঐতিহ্য ধারাবাহিক তথ্য নয় শুধু, তা-ই ঐতিহ্য। তাতে আনন্দ এমন-কি গর্বও, যা প্রকারান্তরে গ্লানি। সতুকে শিক্ষিত করার মরিয়া চেষ্টাতেও ঐ গ্লানি অমরত্ব পাচ্ছে। অথচ সতুর লক্ষ ছিল বাসের কনডাকটরি, তার হাতে দুর্গম জায়গার একগোছা টিকিট থাকত সর্বদা। কানাই মাস্টারের স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটিমাত্র মিথ্যাচার তাকে টের পাইয়ে দিয়েছে অনিবার্য ছকটি। এখন-ও সে রীতিমতো অনুভব করে কী করে কখন মহার্ঘ টিকিটগুলো স-প্রাণ উড়ে গেছে।

নীল রঙের রেজাল্টটির জন্যে ভ্যানিশিং-লোশন কেনার চাতুর্য ছিল। তাতে অঙ্কের শূন্য খোপটি সন্তোষজনক ছ'য়ের ঘরের নম্বর পায়। হাই-স্কুলে যাওয়ার দিন দ্রুত এসে পড়ে। চন্নুর দাদু রেজাল্ট প্রসঙ্গ তুলে অন্নকে ঘায়েল করছিল : দশজনের একজন হইবো···দেইখেন···। অন্ন তখন ক্রমে সংজ্ঞা হারাচ্ছে, নেশা গেঁজে উঠছে, সে ভাসছে! বৃদ্ধের প্রতি কী কৃতজ্ঞ সে! অথচ তা প্রকাশ করতে পারছিল না, ফলে কষ্ট, বানানো ওই গল্প, গল্পের সামগ্রিক মিথ্যাচার বিশ্বাস করছে বলে অন্ন বড়ই একা। সত্নু তখন এই জালিয়াৎ বৃদ্ধকে সগোত্র ভাবে, যেহেতু সে নিজে-ও রেজাল্টটি জাল করেছে। আর দুজনের থেকে সম-দূরত্বে অন্ন গভীর-একা। সেই প্রথম সত্নু টের পেয়েছিল অন্নর ঔজ্জ্বল্য, তার এত-সব কামনা আদতে কতখানি নির্দোষ, জালিয়াতির বৃত্তান্ত তার কত অজানা। সত্নু এখন স্পষ্ট বোঝে, সজ্ঞানে সে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চেয়েছে, ফলে ঐ ঠগী কারবার নিছক নিয়ম-লঙ্ঘন নয়, বরং তা-ই সমর্পণ, আকাঙ্ক্ষা।

তখন সত্নুর সামনে দুটি চরিত্রের মর্মরমূর্তি। এক তো দলিলের মুসাবিদা, ন্যুব্জ চন্নুর দাদু ও এনামেল টাক। শাদা নির্দোষ কাগজের আয়তক্ষেত্রে বর্ণমালা হেঁটে যাচ্ছে, কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের অনুকৃতি, সেখানে নির্বোধ বুড়ো আঙুল সরু রেখা সমেত ডিম্বাকার ছাপ রাখে। আর একজন বিদ্দেসাগর, দারিদ্র ও ব্রাহ্মণ্যহেতু সত্নুর সঙ্গে যার তুলনা শোনা গেছে বহুবার। অজস্র মানুষ চেষ্টা করেছে এই আদর্শটি তাকে ধরিয়ে দিতে, প্রবল দামোদরের ভুল-জলোচ্ছ্বাসই একমাত্র প্রতিবন্ধক। সত্নু এখানটায় ভয় পেত। সে এড়াত চাদরজড়ানো ঐ প্রস্তর। যেনবা নির্দেশ উঠে আসত সমগ্র শরীর মন্থন করে, সেখানে নিষেধ। ভুল হওয়া ও ভুলে যাওয়া চাঞ্চল্যে, দৌরাত্ম্যে নিত্যনৈমিত্তিক এক-একটা দিন গড়িয়ে যায় রবারের বল। গলু আর রণ রোজগেরে হয়ে যাওয়ায় খুচরো পয়সার ঝনঝনাৎ শব্দ কী রোমহর্ষক! ঐ শব্দের জন্যে কী তীব্র প্রতীক্ষা! ঐ শব্দ আলাদিনচিরাগ, সে সম্মোহিত।

চ!

চ।

সিনেমায় যাবো না।

ঠিক আছে।

চ, কালীঘাট যাই।

বেশ।

নাহ্, মাংস ঘুগনি খাবো।

খাবো।

এক কাজ কর, রাস্তায় একটা চুয়ান্নি রাখি···যে শালা নেবে···

মজা হবে···চ···চ!

সুলতান আলম স্ট্রিট ও ট্রামরাস্তার সংযোগে যে বাঁকটি গড়ে উঠেছে, পেছনে চারু মার্কেট, পেছনে বরফকল,—সেখানে গলু একটা সিকি রেখে দেয়। রাস্তায় ঐ সিকিটি পড়ে থাকে আলোকবৃত্ত, উজ্জ্বল-চোখ! তিন জোড়া চোখ সামান্য দূরত্ব রেখে সেখানে ঐ প্ররোচনায় নিবদ্ধ। বিভ্রান্তি ও লোভের ফাঁদ পেতে তিনজন শিকারি ধ্যানস্থ। একেকটা মানুষ এগিয়ে আসে আর তারা মানুষটাকে বুঝে নিতে চায়, বাজি ধরে। একেকটা মানুষ ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। সে, তাদের ভাবান্তর ঘটে, ঐ ভাবান্তর কা অসহায়! লোকটা চার দিক সতর্ক দেখে আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনজোড়া হাত বেজে ওঠে। উল্লাস, করতালি, হো হো শব্দ। হো হো শব্দ এখন পিচরাস্তায়। ঐ শব্দ ও উচ্ছ্বাসে চাকার ঘূর্ণন, তীব্রগতি, দরদর ঘাম। ভাড়ার সাইকেল শাদা দুপুরে তাঁদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, লেকের ঘেরা রেলিং, ও ঢাকুরিয়ায়। ওদিকে ভাটিখানা, কলাবাগান, কুদঘাট ও আদিগঙ্গা। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে তারা ঐ গঙ্গা দেখে, পাঁকের স্রোত দেখে। কখনো-বা আকস্মিক স্টেটবাস ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন মৃত্যু, উত্তেজনা, ঘাম। এক্ষেত্রেও যা ঘটে, ডোবায় ভাসানো ভেলারই পুনরাবৃত্তি তা। রোমকূপ আশ্রয় করে মৃত্যু, সিরসির স্রোত খেলে, সামান্য জমে ওঠে, বিকশিত হয় রক্ত-বিন্দু! ছড়ে-যাওয়া কনুই কিংবা গোড়ালিতে থুতু লাগানো হয়। আর পর-মুহূর্তে দুর্দান্ত চাকা ঘুরছে, যাতে রাস্তাঘাট দোকান সমেত বদলে যাচ্ছে সমগ্র তল্লাট। কতদূর যেতে পারে সে! কতদূর যাচ্ছে! গতি তখন চুম্বক, মাটকোটার ঘর ও তাবৎ

স্মৃতি বাস্তবিক গুটিয়ে যাচ্ছে তাতে। অন্ন পড়ে থাকে, পরিত্যক্ত, সমস্তই মামুলি, ঐটুকু সারাদিনের সামান্য ভগ্নাংশ, এমন-কি তাতে আর শব্দও নেই। সন্তু তীব্র বোঝে অন্ন সম্পর্কে তার আকর্ষণ, সেই শরীর-টান, কত কমে আসছে, কত সরে যাচ্ছে সে। এই বোঝায় কিছু একটা বিঁধে থাকে, রক্ত-ক্ষরণ থাকে, আবার তা যেন অনিবার্য, অমোঘ টান আসছে অ্যাসফল্ট রাস্তার। সাইকেল-চাকাটি প্রতীক তখন।

গলিঘুঁজি, বাসরাস্তা, ট্রামরাস্তা পেরিয়ে তারা পুনর্বার কালুকাকুর সন্ধান করেছে, রহস্যময় একটি ঠিকানা ও ব্যক্তিত্বের সন্ধান বড় জরুরি ছিল! অভিজ্ঞতায় সেই একই নৈরাশ্য শিথিল, যেন-বা তারা দীর্ঘকাল এই অনুসন্ধান-কাজে লেগে আছে। আর সাকুল্যে এই মেহনত তাদের বারবার বিপন্ন করে, যেন ঐ স্বাচ্ছন্দ্য তাদের প্রাপ্য নয়, যেজন্যে কালুকাকু একটি প্রাচীন দালান ও সিঁড়ি সমেত লোপাট হয়ে গেছে। অন্ন একবার মাত্র এসেছিল, তার বর্ণনায় টানা দীর্ঘ কাঠের সিঁড়ি ছাড়া আর যা আছে তা ঐ সিঁড়ির-ই ভুতুড়ে শব্দ। ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাতে পতনের অনুভূতি। মনে হবে কেউ অনেকদূর উঠে হঠাৎ পিছলে পড়ে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে। ঐ পতন-শব্দের অনুভূতিময় বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল অন্ন। তাতে সংশয়, দালানটি কতখানি উঁচু, কতগুলো সিঁড়ি আছে, যে পড়ে যাচ্ছে তার কী হবে?

দীর্ঘ সিঁড়ি তখন ধোঁয়ায়, ফলে অন্তহীন, সন্তু এই সিঁড়ির ভীতি-স্পর্শ পাচ্ছে।

অ্যাহন দ্যাশের মাথা…।

অন্ন বলেছিল, তা-ও যেন কতদিন আগে, যেজন্যে সন্তুর কল্পনা ছিল একটি সুবৃহৎ মাথার। এখন সে জানে অন্ন আদতে কী বলতে চেয়েছে, জানে অন্নর উদ্দেশ্য ছিল একটি সামরিক শোভাযাত্রা, বিস্ফোরণ ও দুর্লভ একটি কলম বোঝানো। যে-কলমটি ঐ মাসিক বৃত্তির টাকা পাওয়ার সমস্ত রাস্তা সুগম করেছে, অন্ন পেনশন পাচ্ছে, প্লাস্টিক কারখানায় যেতে হয় না। আর এত সব-কিছুর গভীরে, পশ্চাতে, থেকে যাচ্ছে ঐ দুটি

শব্দ : দেশ এবং দেশের মাথা। দেশ শব্দটি কতই না বদলে যাচ্ছে, বদলে গেল, হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয় তার ক্রমিক বেড়ে ওঠার মধ্যে যেন-বা এই ব্যঞ্জনাটিও ধরা আছে। সাইকেল-চাকা থেকে সে তখন চলে যাচ্ছে একটি দুরন্ত গতির রূপকে, আর মুদ্রিত অক্ষরে। যেভাবে সে অনুভব করে, পুড়ে যায় জ্যৈষ্ঠে···বর্ষণে···ব্যাঙের, ঝিল্লির টানা শব্দে যেমন শ্রুতি নেই, অথচ ঐ শব্দ কী গভীর! তাতে যুক্ত আছে, থেকে যায় প্রত্যন্ত মানুষ যাকে সে দেখে নি। সেখানেও কী সম্পর্ক! দেশ-ভাগ প্রসঙ্গে অন্ন যেমন কালু শেখের কথা বলত, কালুর বউর কথা : ঠাইরান ভাত খ্যান···কী সম্মানটাই না করতো! আর ছিল সম্পদরাজি, কৃষিপণ্য, দাপট।

বিপদে-আপদে মাইনষে বুক দিয়া করতো···

বিরহের দুরন্তটান ছিল অন্নর উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপণের বিশেষ রীতিতে, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার ছন্দে। শরীরের সামগ্রিকতায় শোকও ছিল। এত-সব অনুভূতি কী অশ্ব-বেগ-সম্পন্ন! যেন প্রকৃতই তার শরীর থেকে সূর্য-মহিমায় নির্গত হয়েছে বর্ণালী অশ্ব : তেজ, ক্ষমতা, লোভ, মায়া, আরো কত কী! তার শরীর তখন উদ্ঘাটিত, অজস্র শিরা লাগাম মাত্র যা নিয়ন্ত্রণ করছে এমন-কি দেশপ্রেম। অন্নর চেষ্টা থাকত পরিস্থিতিতে মহত্ত্ব আরোপের, সে অকপট বিশ্বাস করত তা-ই মহৎ, মহতী অনুভূতি। কালু শেখ থেকে যে মহত্ত্ব দ্রুতগামী আশ্রয় করে কালু ঠাকুরপোকে, মানুষটি দেশের মাথা। সতুর মনে পড়ে যাচ্ছে মাথাটি, মাথার খুঁটিনাটি বর্ণনা :

কপাল গ্রাস করছে মরুস্রোত, ঐ স্রোতের পেছনে নির্লোম বৃত্ত, সেখানে জাগ্রত শিরা, জট। শিরাটিতে কিছু একটা স্রোত ছিল, কম্পন, তা যেন-বা সাকুল্যে ঐ বৃত্তাকার ঔজ্জ্বল্য আরো গুরুত্বপূর্ণ করেছে। কপালের নীচ থেকে শুরু হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, মামুলি একটা মুখ। ফলে একটি সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা নজর করা সম্ভব। ওপর দিকে আধিভৌতিক ঐ স্নায়ু-কুণ্ডলীর সঙ্গে তাবৎ দেশটি যুক্ত, যেন-বা সে-সবই যান্ত্রিক, রঙিন তারের সমষ্টি, রেডিও, টেলিগ্রাফ :

হ্যালো!

হ্যালো!

টরে···

টরে টক্কা

আজ সন্ধ্যার দিকে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত···

দেশ গঠনের জন্যে আমাদের প্রয়োজন···যুব সম্প্রদায়কে···হিন্দু মুসলমান···দাঙ্গা···আমরা ভারতবাসী···

তিনি এত-সব কথা বলেন নি, একবারমাত্র দেশগঠনের প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন, তাতেই প্রকাশিত সমগ্র দেশটি তিনি জানেন, বড় নিশ্চয়তা ছিল। সতু এতাবৎ গুরুগম্ভীর যাবা কথা যা শুনেছে, সবই ঐ মুখ-নিঃসৃত মনে করে বিস্মিত তার আদত বিস্ময় ছিল অন্যত্র। অভিজ্ঞতায় তার আন্তরিক অনুভূতি সবই স্থান নির্ভর, সামান্য ক্যাওড়াপাড়া-সংলগ্ন। আগে সে এই ক্যাওড়াপাড়া বলতে দেশ বুঝত, এখন দেশ শব্দটির ব্যাপ্তি জানায় বড় অসহায়। জানে না কী করে ঐ ব্যাপ্তিতে পৌঁছানো যায়, অন্ন কিংবা সরিও। গলু, রণ, চন্নুর মা, ক্ষেমি কেউ জানত না। ক্ষেমি তো মরেই গেল, তার জানাও হল না। অথচ সে গোরা-সৈন্য দেখেছিল, গাঁধী-বাবা দেখেছিল।

কত দ্রুত বর্তমান হারায়, শামুকখোলায় গুটিয়ে নেয় নিজেকে। প্রাচীন সবুজ সময়-চিহ্ন সমেত ক্রমাগত কালো, অতীত। এই অন্ধকারে জালি আছে, বাহারি নক্সা আছে, গোল ও চৌকো আলো কদাচিৎ ঝলসায় সেখানে, ফলে স্মৃতিও থাকে পারম্পর্যে। এই স্মৃতি ইতিহাস, ইতিহাসের বিভ্রম। বাহুল্যবর্জিত একটি টানা কাহিনী, যাতে তুচ্ছ বস্তু অযৌক্তিক রাজকীয় গুরুত্ব ও সম্বর্ধনা অর্জন করে। মহাপুরুষের জীবনীতে যে-সব আপাত-তুচ্ছতা ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়, সেখানে একটি শহর, গাছ, কুকুর ও কবর কী গুরুত্বপূর্ণ! প্রাচীন সৌধ, স্থাপত্য সম্ভার ছাপায় যেন-বা ঐ ভঙ্গুর সেতুটি নির্মাণ করে, কত কী যে তখন সংযুক্ত হয়! বীজ, বৃক্ষ, পত্রপল্লব, পুষ্প ও একটি পরিপক্ক ফল তখন বিমূর্ত, স্রোত-বাহিত।

পূর্ণ দুপুর এখন শৈথিল্য, পেনসন মঞ্জুর হওয়ার স্বস্তি। কারখানা-সংলগ্ন ভোজপুরি গানের কলি ছিন্ন ধোঁয়া, তাতে ব্যক্ত হচ্ছে এই আকাঙ্ক্ষা, 'মেয়ে তুই কাঁদিস না শহর থেকে রেশমি চুড়ি আনব…'। এখন ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ, মন্থর দুপুর কোনো আহ্বান রাখে না : অ সন্তু! সন্তু! এই আহ্বান ক্রমে হারাচ্ছে সেই তীব্রতা, প্রয়োজনহীন তা আর ধ্বনি হয়ে উঠবে না। এখন তা কেবলই কার্যকারণ সূত্র, ঐ সূত্রের আধিপত্য। 'সন্তু' এই ধ্বনিতে যে বায়বীয় কম্পন ছিল তা এখন কুণ্ঠা। এখন তাকে ডাকতে গেলে অন্নর পক্ষে মজুত কারণ থাকা চাই, এই আহ্বান দাবি করে গুরুত্ব। দীর্ঘ বাক্যালাপ।

সন্তু!

বল।

সন্তু।

কী!

নাহ্ অ্যামনেই…

ক্যানো?

কী করোস…

ক্যানো?

নাহ্।

কী!

কিছু না!

প্রতিদ্বন্দ্বী স্নেহ তখন অন্নকে চিত করে ফেলে, তার শাদা বুক পড়ে থাকে কর্তৃত্বহীন। অজস্র লাল-তিল দেখা যায়। শূন্য তাকে ঘায়েল করে, হামলে পড়ে চামড়ার কুঞ্চনে। সে ঘামতে থাকে শরীর নিঃশেষ করে, যেখানে যত জলের সঞ্চয় ছিল।

ক্যাওড়াপাড়া ও সুলতান আলম স্ট্রিট বড় ওতপ্রোত, কোনো ছেদ কিংবা শূন্যতা নেই। বড় প্রাচীন এই মিশ্রণ। তাতে সুলতান-অনুষঙ্গ দরিদ্র জনসমষ্টিতেও কী বর্তায়? কোনো নবাব বাদশা, জাফরির কাজ, কাঁসার পিকদানি, তৈলাক্ত অশ্ব, হ্রেষা ইত্যাদি এসে যায়, অথচ বিশ্বাস

হয় না। সুড়ঙ্গ অন্ধকার, নোনা ইটে প্রকীর্ণ বট-চারা ও বিশাল দরজার ঘুণই একমাত্র সত্য। ট্রাম-রাস্তা থেকে এই কানাগলি সংক্ষিপ্ত, কোনো-ক্রমে গড়ে উঠেছে, এমন-কি এই গড়ে ওঠায় কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। ফলে রেখাটি সরল নয়, বক্র নয়, জটিল এক যাত্রা মাত্র। সুলতান আলম স্ট্রিটের, ক্যাওড়াপাড়ার, কোনো ইতিহাস নেই।

যদিও এই গলি ও অন্তিম জল-জমির অভ্যন্তরে আলোড়ন ছিল। প্রাচীন ও দীর্ঘ আলোড়ন। ঐ অভ্যন্তরভাগ হিরণ্যগর্ভ যেন-বা। ঋজুরেখ বৃক্ষ ও পত্র-পল্লব-ছত্রে এক বিপুল উত্থান ছিল। পৃথিবীর বৃত্তান্তটি সেখানেও কার্যকর, সেই প্রাচীন অগ্নিপিণ্ডে কত বিবর্তন···তরল, জলীয় শৈত্য।···ভূত্বকে কুঞ্চন ও বিন্দুসমূহ। তাতে কি গোপন ছিল সূক্ষ্ম বীজে পূর্ণায়ত পাতা? পাতায় ছিন্ন আলোক, আংশিক ছায়া। বিচিত্র সেই বর্ণ-সম্ভারে সরল ও জটিল রেখাসমূহ, জ্যামিতিক আকার সমস্তই বিন্দু-আশ্রিত জীর্ণ-মায়া মাত্র। স্থূল মালগাড়ির ঘর্ষণ আর ওজন বাবদ ছিন্নভিন্ন, অথচ এই বর্ণ, বিন্দু ও ধ্বনিতে আশ্লিষ্ট ছিল গ্রহটির গতি, নক্ষত্র পরিক্রমা। নিয়ত একটি ফল তাতে সঞ্চয় করে নিত রস, ও লাবণ্য : বয়স কি সেই পরিপক্ক ফল, সেই অনুভব?

এখনো ঋতুক্রমে চক্রটি অনিবার্য শ্লথ ঘুরে যাচ্ছে বলে সামান্য পাতা খসে পড়ে শব্দহীন। বিবর্জিত সেই পাতা গভীর শুষ্ক, উড়েছিল বিহঙ্গ ভঙ্গিমায়। অন্তর্লীন শুষ্কতা, হলুদ বর্ণটি উদ্‌ঘাটিত, যেন তাতে অন্তিম চূর্ণতাও ধরা আছে, এমন কি তার আর্ত-মর্মর, যেন ঐ বিনাশ পাতাটিতে লালিত। অথচ কী ক্রীড়াময় বাতাস-অভিমুখে! বাতাস-গতিতে! সদ্য পাতার এই স্বতঃস্ফূর্ত বিহার, বিভ্রমে বন্দী যেন-বা। রহস্য! বর্জিত পাতাটি শূন্য স্তর পেয়ে যায়, উড়তে থাকে। এরকম কত তুচ্ছ পাতা খসে গেছে।

সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার তুচ্ছ, পলকা গেরস্থালিতে হাঁক-ডাক ও উল্লাসে প্রাচীনত্ব ছিল। ব্রতকথা ও মাঙ্গলিকে উদ্‌বাহু স্বস্তিকা চিহ্ন ধারাবাহিক। অথচ কোনো ইতিহাস নেই, বিস্মৃত সুলতানের ঘোড়া, রেকাব, জিন কিছুই নেই। আছে দলিল-দস্তাবেজ,

মালিকানার হস্তান্তর। আর বুড়ো আঙুলের ছাপটুকুই তাতে যথেষ্ট। দু-একটি প্রাচীন বৃক্ষ ও শেতলার থানটি এখন-ও অক্ষত, যদিও ফাটল আছে, সামান্য শ্যাওলা, পোষ্য অন্ধকার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার এলোচুল ওড়ে, নিখুঁত গোল সিঁদুর টিপ একসময় নষ্ট হয়ে গেলে শাদা ফেনায় ভর আসে, ভর হয়। দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ ও শত্রুর বিনাশ সুনিশ্চিত করে মাঝবয়েসী এক সধবা নারী কত কিছু বাতলে দেয়। ঐ নারীর প্রকৃত বিশ্বাস আছে, কারণ এতে তার অন্নবস্ত্র হয়ে যায়। 'ত্যাকন তোমার টেরাম্ গাড়ি কোতায়!' এখনো কেউ বিস্ময় গোপন রাখতে পারে না, তার লোলচর্মে বর্তমান কোনো স্থিতি পায় নি, সে পশ্চাদ্গামী তাতে সে আনন্দিত, নিরাপদ। আবার এত দীর্ঘকাল বেঁচেছে বলে, সে আর কাল সমার্থক : টমি দেকেচো ?

থালে আর দেকলে-টা কী ?

এই-সব গল্প, বৃত্তান্ত বড় নিষ্প্রভ। মরে আসছে। ক্যাওড়াপাড়ার দল-ছুট বর্তমানে এই গল্পের কোনো স্থান নেই, শ্রোতা নেই। বরং এই গল্পের বিপরাতে থাকে চটুল হাসি আর মাইকের চোঙ থেকে ফিল্মী গানের বজ্র-নির্ঘোষ। একটি সাইকেল রিকশা জটিল তার আর ঐ যন্ত্রাদি সমেত রাজ মহিমায় বৃত্ত আঁকে, রিকশাটি চক্রাকারে ঘুরে যায় বলে মানুষজন গণ্ডিবদ্ধ, পতপত উড়ে যায় রঙিণ টিকিট, তাতে মূর্ত অমরাবতী। ছোকরার দল শিস্ দিয়ে ওঠে, আহ কী গান! সুরে ইন্দ্র জাল : মেরা দিলনে পুকারে আজা···। চতুর্দিকে, শূন্যে, তখন চক্রাকারে নেমে আসছে রেশমজাল, সুখস্পর্শ। কোথাও আর ঝিল্লির দীর্ঘ স্থৈর্য নেই, শূন্যে সেই অনন্ত বুননকার্য আপাতত স্থগিত। টানা ঐ শব্দে যে আহ্বান, যে শংকা সব-ই উধাও। আবার এই তিরোভাব এত ক্রমিক, ক্ষয় এত মন্থর, শ্লথ, যে কেউ মনে রাখে না, মনে রাখে নি। প্রাচীন কিছু কী ছিল!

তখন মলিন কারখানা, কয়েকটি নারকেল গাছ, তুচ্ছ ডোবা ও গেরস্থালিতে প্রকীর্ণ আলোক শূন্যতার অবলম্বন। কী যেন জ্বলে যাচ্ছে উর্ধে ? শূন্যে মেলাচ্ছে মহার্ঘ কিছু। মাথার ওপর সেই শূন্যতা বড় বেশি

নীল, নির্দয়। নীলে দৃষ্টি চলে না, বিদ্যুৎ-চমকে শুধু নারকেল পাতার শির স্পষ্ট, জাগ্রত। ধোঁয়া ও মালিন্যের স্তর ঐ তীব্র রেখায়, গমনে, চিরে যায় এখনও···

গলু···উ···

কেউ চিৎকার করেছিল, বড় বিপন্ন সে।

তারপর-ই সমবেত পদশব্দ, একজন, দুজন···অজস্র স্রোত যেন, তারা ছুটছে। ক্রোধ এবং ঘেন্না এবং ক্রোধই তাদের লক্ষ্য। ক্রোধ যেন তীক্ষ্ণ তীর, ক্ষিপ্র গতি, যেন ক্রোধই শরীর, শাসক। ঐ যুথবদ্ধ পা, ছোটার দুরন্ত গতির নিয়ামক। সাতটি অশ্ব-লাগাম সেই রক্তবর্ণ পুরুষের হাতে, সে গলুকে ছিঁড়ে ফেলবে, তার চুল সমেত মাস্তিষ্কের চামড়াটি খুলে নেবে, সামান্য হাড়, শাদা ও অপরিণত সেই হাড় কাঠামোটি বের করে আনবে চামড়ার প্রাসাদ ভেঙে। আশ্বাস ও এই আশংকা কারখানার দেয়ালে, পলেস্তরায় নির্বাচনী পোস্টার সমেত কিছুকাল সেঁটে দেওয়া হয়, কাঁচা লেইয়ের গন্ধে আকৃষ্ট কয়েকটা মাছি তুঁত-বিষে মৃত। গলু কেন ওখানে ঐভাবে হঠাৎ ফেটে পড়ে সে-সবই অজ্ঞাত থেকে গেছে, পোস্টার ও দেওয়াল অনুষঙ্গটি শুধু বিভিন্ন জনের বর্ণনায় অপরিহার্য ছিল বলে অনুমান এতে কিছু একটা ছিল। গোপন কোনো সম্পর্ক।

হয়ত গলু বড় বেশি স্বাধীন, মুক্ত হয়ে গিয়েছিল কৈশোর মুহূর্তে, হয়ত তার ভালো মন্দ বিচারে অলস পঙ্গুত্ব নেই। যেভাবে সে সটান বালি হাঁস টেনে আনে মাটিতে, সেভাবে বুঝেছিল কানাইদার দাপট-স্ফীতিতে একটি ছিদ্র থাকা একান্ত প্রয়োজন···। ক্যাওড়াপাড়া তার এত-সব চিন্তার কোনো হদিশ পায় নি, বা ঐ পাড়াটি গলুকে খুব সহজ ভাবে নিয়েছিল বলে কখনো তদন্ত করে নি। ফলত জানত না কী ভাবে গলু এই দুরন্ত গতি গোপন করে। ধ্বংসাত্মক ছুরিটি সে কখন, কোত্থেকে, কেন কিনেছিল? গলু বস্তুত কী ভেবেছিল? কী চায় সে?

তারা শুধু থ হল, আতংকও। যখন গলুর হাতের মুঠো থেকে, তার শরীর থেকে নিঃসৃত হয় ঐ বিদ্যুৎ-অংশ। উলঙ্গ সেই বক্ররেখা হাতল

সমেত বিস্তৃত করে ছায়া। রেখাটি স-প্রাণ গলুকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, গলুর চেরা চোখ-দুটি তাতে স্থির। শরীর দাঁড়িয়ে গেছে একটি বিন্দুতে, এতখানি প্রস্তুত সে। সম্পূর্ণ ঘটনাটির স্থায়িত্ব কয়েক মুহূর্ত। গলুর কোনো পরিকল্পনার কথাও জানা যায় না, যেহেতু প্রতিপক্ষ পিছোতে থাকে ও এক সময় ছুট লাগায়। ফলে অস্ত্রটি প্রকাশ করে ফেলায় গলু ব্যর্থ, শোচনীয় ব্যর্থ। সে নিশ্চয় ঠাণ্ডা মাথায় এই পরিণতিতে এগোয় নি, নিশ্চয়ই কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। আচমকা চড় খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারায় মাত্র। তার পর অত্যুজ্জ্বল সেই ছুরি ও পোস্টারের কথা অনেক হয়েছে, আলস্যে এবং উৎকণ্ঠায়। চড় খাওয়ার ঘটনাটিও ক্রমে পল্লবিত, আজগুবি সব কারণ আবিষ্কৃত হয়। যদিও ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সবাই ছুরিটির কথা বলে, পোস্টারটির কথা বলে। গলুর বয়স নেহাত-ই কম, তাতে আরেক প্রস্থ বিস্ময়। তারা ভাবতে থাকে গলুর হাতের ঐ ছুরিটি, সূক্ষ্ম কারুকাজে কতখানি দ্বেষ ছিল, কতখানি ঘৃণা। বা, অস্ত্রটি তো নেহাতই ঝোঁক, নেশা, অ-সচেতন বীরত্ব মাত্র। গলুকে তারা কতটা গুরুত্ব দেবে? গলুর বিপরীতে, বিরুদ্ধে কিছু ছিল কি যা তারা জানে না, গোপন-হিংসা, যা ঐ ছুরি সপ্রমাণ করে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র ছিল কি?

এরকম জিজ্ঞাসা সন্তুকেও আলোড়িত করে, গলু ও তার মধ্যে কতখানি দূরত্ব, কতটা শূন্যতা ছিল সে-সবই উদ্‌ঘাটিত এখন। অস্ত্রটি বিষয়ে সন্তুকে সে দু-একটা মামুলি কথা বলেছিল, তার বেশি কিছু নয়। হয়ত তার বেশি গলুর তখন কিছুই বলার নেই। অথচ নিশ্চিত অনুভব ছিল, গলু কিছু একটা অনুভব করেছিল, সে বুঝেছিল তার একটি উজ্জ্বল ছুরি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথাটা সে চেপে যায়, বা সন্তুকে একটি সীমা, একটি ছকে সে যেন বা প্রতিষ্ঠিত দেখেছিল। সে জানত সন্তু এই-এই পারবে না, সন্তু এই…সন্তু এই নয়…

বিলম্বে হলেও গলুর খোঁজে ক্যাওড়াপাড়ায় পুলিশ আসে, তারা গলুকে না পেয়ে জেরা করার জন্যে শ্যামকে নিয়ে যেতে চায়। তখন, ঐ দৃশ্যে

কানাইদাই ত্রাণকর্তা। সে বাহবা পায়। পরে সকলে সাব্যস্ত করে গলু গোঁয়ার, গলু মূর্খ, গলু সম্পর্কে এভাবে নানাবিধ আশংকা গড়ে উঠতে থাকে :

ক-দিন পরে সিঁদ কাটবে

ডাকাত।

ডাকাইত!

খুন করবে!

খুনী।

চোর!

ডাকাত!

অথচ গলু যে তখন কোথায় কেউ জানে না। পলকে সে যেন উড়ে গেছে! যেন একজোড়া ডানা ছিল তার। গোপন, নিজস্ব। কেবল অদৃশ্য ছুরিটি এতদ্অঞ্চলে কী গভীর তৃষ্ণা রেখে যায়! শিশুরা ছুরিটির কথা বলাবলি করে। কল্পনায় তখন সেই ছুরি কী দীর্ঘ! ঐ ছুরির যে দীর্ঘ ছায়া পড়েছিল মাটিতে তা যেন অক্ষত আছে। ছায়াটা কী করে যেন অস্ত্রটি থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ক্যাওড়াপাড়ায় তা এখন আমূল বিদ্ধ।

ক্যাওড়াপাড়ার ছিটে-বেড়ার দেয়াল ও ঝুপরি অন্ধকার আগলায়। দীর্ঘকাল তা অন্ধকারের অবলম্বন, আকার। টেলিগ্রাফ তারটি এমনকি ঐ অন্ধকারেও জাজ্জ্বল্য, মসৃণ চলে গেছে, ডোবা নারকেল গাছ ছাড়িয়ে যেখানে গলুর দুরন্ত আত্মা হয়ত বা নিদ্রামগ্ন। চন্নুর দাদুর শ্লেষ্মা শুষে নেয় ফিচেল বাতাস ও ঝিল্লির ডাক। সেখানে এই টেলিগ্রাফ তারের অলৌকিক কাহিনী। বাতাসে ঐ শব্দের প্রবেশ ধীর স্থৈর্যে, তাতে ঐ বৃদ্ধের কফ, পিত্তি এবং বয়স ওতপ্রোত। সে জানায় এই পোস্টের কী অপার মহিমা, সমগ্র দেশটি কী ভাবে টেলিগ্রাফ তারে আবদ্ধ, যেজন্যে গলু ক্যাওড়াপাড়া থেকে হাওয়া হয়ে গেলেও আদতে সে গভীর ভাবে যুক্ত আছে। নিয়মিত খবরাখবর পায়। যে লোকটা কলের গান

বাজাত সে জাহাজী হয়ে যাওয়ায় ক্যাওড়াপাড়ার বারান্দায় আর ভিড় থাকে না।

এই-সব ব্যক্তির অন্তর্ধানে সন্তুর মস্তিষ্কে খুলে যাচ্ছে প্রকৃত মানচিত্র, যেন সে তাদের অনুগামী, ক্রীতদাস ছায়া, ছায়ায় বিস্মরণ নেই। টেলি-পোস্টটির গুহ্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত, সেখানে কী মহতী সংলাপ, অন্ধকারে ঋজু, অলৌকিক সেই পোস্ট চন্দ্র-স্পর্শ পায়। সুলতান আলম স্ট্রিটে মামুলি শব্দ থাকে। শব্দ ধরে রাখে সাঁকো, লিকলিকে বাঁশ। একটি পদক্ষেপ ফাঁস করে দেয় নাইট শিফট্‌, 'নিউ ইণ্ডিয়া টুলস'-এর দরজায় নিচু হয় কেউ। আরো শব্দ থাকে। শব্দ-সেতু। সাঁকো। ক্রমে গ্রহটির বুক ও পিঠ বদলে যায়। খর-তাপ দগ্ধ করে তাদের, চন্নুর মা আর অন্নকে। মাটকোটায় চন্নুর মা ও অন্ন তখন ভিন্ন দৃশ্য রচনা করে, তাদের নাক স্ফুরিত, চোখে সেই পরিচিত উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য।

তখন তারা উল্লেখ করছে কত পাপের কথা। নিজ নিজ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আনছে। খননকার্য চলছে, তাতে স্মৃতি ধ্বংসস্তূপ। জন্মাবধি তারা কত-না নৃশংস কাণ্ড দেখেছে: দেবতার অধঃপতন···ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত মৃত শিশু···লুণ্ঠন···দেশ-ভাগ···লুণ্ঠন, মন্বন্তর···লুণ্ঠন, রায়ট··· আর গুম খুন···।

অহিংসার কোনো স্মৃতি নেই তাদের।

আপনে তো মাইসামশাইর নামে মূর্ছা যান···জানেন না তো কী চীজ! যুদ্ধের বাজারে কী না করছে···টাকা কী অ্যামনেই···অ্যাহনও মুখ দিয়া লালা পড়ে···আধ পাগলা ছাওয়ালের লগে বিয়া দিয়া আমার বাপের কাছ থিকা কম টাকা নিছে···হেই ছাওয়াল···কী কমু সন্তুর মা দিদি অ্যাহনও বেহুনায় মোতে···

আর চোখেমুখে হিংসা ও ঘৃণা যে-ভাবে পরস্পর মিশে যেতে থাকে তাতে চন্নু বড় ভয় পায়। চন্নু নিজের জন্যে ভয় পায়, তার সরল অবোধ পিতা আর এই বিলাপী নারীর জন্যে ভয় পায়। তার মুখে আতঙ্কের সূক্ষ্ম ও জটিল রেখাসমূহ এমন ফুটে ওঠে যেন কোথাও ষড়যন্ত্র আছে গোপন, ভয়াবহ। বিশেষ যখন চন্নুর মা ফাঁস করে দেয় আরেকটি

অভিসন্ধি: বুইড়ায় চায় আপনারে উঠাইতে···পাকা করবো···ভাড়া বাড়াইবো···। চমুর মার হাতে তখন একটি সবুজ পাতা বিস্তৃত, তাতে চুন-প্রলেপ, এসে যাচ্ছে জন্মকথা, সত্তুর জন্মবৃত্তান্ত। সে চম্বুর মার হাতের ওপর হয়েছে সুতরাং মায়া ছিল, মায়া আছে। যদিও জানাই তাদের সাধ্য নয় বৃদ্ধকে অতিক্রম করা, অগ্রাহ্য করা, ফলে অত আস্থা এবং বিশ্বাসেও বিরহ থাকে। ষড়যন্ত্র আর-ও প্রকট তখন।

ক্রমে তারা স্বভাব-ভঙ্গিমায় সবই ভুলে যেতে পারো। তদ্দিনে শ্যাম টিনের স্যুটকেস সমেত রিকশায় উঠে বসেছে, গলুর জন্যে সে একটা ঠিকানা রেখে গেছে। দীর্ঘকাল ঠিকানাটি প্রতীক্ষায় থাকে, এক সময় সেই টুকরো কাগজও বিবর্ণ, তাতে সমস্ত রেখা ও চিহ্ন মিশে যেতে থাকে। যখন সরি উচ্চকণ্ঠে ডেকে ওঠে 'সত্তু···উ' বা 'মা, অ মা ছ্যাখো আইসা।' যেন সে পুনর্বার সংগ্রহ করেছে দুর্লভ লতাপাতা।

কিছুকাল সে বড় বাচাল থাকে, পরে বোঝা যায় ঐ কিছুকাল অনন্ত। এর পর সরির প্রগলভ আচরণ, আশু মাতৃত্ব স্থায়িত্ব পাচ্ছে, সে সংসারধর্ম জেনে গেছে, তাতে কী লীলা!

আমার শাশুড়ি কয় কী···

তোমার জামাইর কথা আর কইয়ো না, বোঝলেন কাকীমা···

আমার ননদে না···

এই-সব বাক্যালাপ সে তোরঙ্গ ঘেঁটে বের করে আনে সঙ্গে হয়ত বা জরির কাজ-করা শাড়িও থাকে। বড় আহ্লাদিত সে। তখন বয়স প্রাচীর ধ্বসে গেছে, দুর্লজ্ঘ্য স্রোত অল্প, চম্বুর মা এবং সরিকে একটি সরলরেখায় এনে দেয়। তারা কত গল্প করে! অথচ সত্তু পারে না হান্-টারবালি বৃত্তান্তটি সরির কাছে প্রকাশ করে দিতে। তার বিরুদ্ধে অম্লর অনেক নালিশ, গলুর প্রসঙ্গ আসে···জানা যায় সত্তুর যতখানি নিষ্ঠা ও শ্রম থাকা উচিত ছিল সে-সব কিছুই নেই।

ল্যাখে না পড়ে না···আমার কপাল···হগলই কপাল···

সত্তু-সম্পর্কিত যাবতীয় খোঁজ-তালাশের অন্তে এই তথ্যটুকু প্রকাশিত পড়াশুনোয় তার মন নেই। সত্তুর পড়াশুনো হবে না, আর এতে সে

প্রতিবাদও করে না, এমন ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝায় যেটুকু না হলে নয় তা ঠিকই হয়ে যাবে। ফলে অন্ন যেন বা দূরবর্তী, সে দূরে সরে যায়, যাচ্ছে। কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া থাকে। বড় মলিন দেখায় অন্নকে, সে নদীর গতিপথ বর্ণনা করে। উৎসের বিপরীতে নদীর অমোঘ যাত্রার কথা বলে, সে কী করবে, আর কী করতে পারে···সত্বর ভবিষ্যৎ সে সে তমসাবৃত দেখে। অন্ন আতঙ্কিত, পরাস্ত, অন্তিম ছড়াটিতে সে এই পরাজয়কে মহিমা দেয়, তাতে স্বর-যোজনা করে :

নাও দিছি, বৈঠা দিছি,
বাইয়া ছাইয়া খাও॥